চরিতমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

২নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন,
ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০২ সাল।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

চরিতমালা

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন,
ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রী আ শু তো ষ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৩০২ সাল।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

চরিতমালার দ্বিতীয় ভাগে দেশীয় ত্রয়োদশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহানুভব ব্যক্তিদিগের চরিত অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইউরোপীয় মহানুভবদিগের জীবনচরিত পাঠ অপেক্ষা দেশীয় মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া দেশীয় বালকবৃন্দের বিদ্যাশিক্ষায় সবিশেষ যত্ন ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে, এতদভিপ্রায়েই এই চরিতমালা সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তক সেণ্ট্রেল টেক্‌সটবুক কমিটির মেম্বর মহোদয়গণের অনুমোদিত হইয়াছে। এক্ষণে চরিতমালা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

দ্বিতীয় সংস্করণে কোনও কোনও স্থান সামান্যরূপ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইতি

শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা।

সন ১৩০২ সাল, ২৭এ কার্ত্তিক।

চরিতমালা

দ্বিতীয় ভাগ।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম।
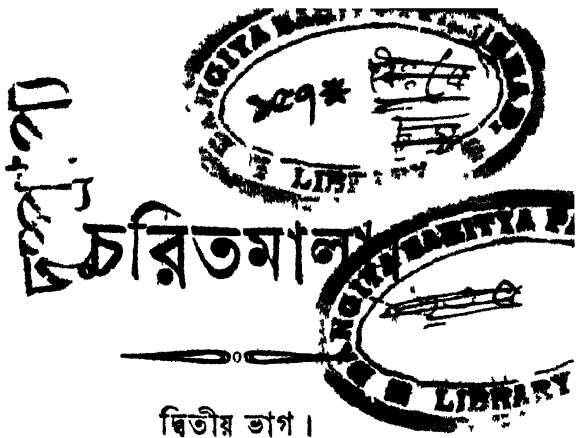
বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা দেশ ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। যিনি এই প্রতিষ্ঠালাভের আদি কারণ, তাঁহার নাম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। বাসুদেব যে কিরূপ প্রভূত অধ্যবসায় ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সহকারে বাঙ্গালা দেশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।

নবদ্বীপে বাসুদেবের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা, এক জন সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ছিলেন, এবং স্বীয় ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি আপন পুত্র বাসুদেবকেও ঐ ব্যবসায়ে

পারদর্শী করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ঐ চেষ্টাও সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছিল।

বাসুদেব বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাশিক্ষার জন্য সাতিশয় পরিশ্রম করিতেন। যৌবনসীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই, তিনি তৎকালপ্রচলিত ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে, তিনি এই সময় হইতেই সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, পৈতৃক পদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিতেন; কিন্তু, ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাঁহার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হইল না। তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তৎকালে পূর্ব্বভারতে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রেরই আদর অধিক ছিল। মিথিলানিবাসী ব্রাহ্মণগণ, ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চায় ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উদয়নাচার্য্য, গঙ্গেশোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানোপাধ্যায় প্রভৃতি সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ ন্যায়শাস্ত্রের বহু সংখ্যক মূলগ্রন্থ রচনা করিয়া, ঐ শাস্ত্রকে নূতন পথে পরিচালিত

করিয়াছিলেন। বাসুদেবের সমকালীন পণ্ডিতগণ এই সকল গ্রন্থের আলোচনায় ও তাহাদের টীকা টিপ্পনী রচনায় ভারতবর্ষের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত বিচারে সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধমতাবলম্বীরা প্রায়ই পরাস্ত হইতেন।

ঐ সকল মৈথিল পণ্ডিতগণের মধ্যে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জয়দেব মিশ্র সর্ব্বপ্রধান। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের যে সকল টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল টীকা এরূপ সরল ও বিশদ হইয়াছিল যে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাসমূহ প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। তিনি পূর্ব্বপক্ষ করিলে, কেহই তাহার উত্তর দিতে পারিত না: এজন্য, তিনি পক্ষধর মিশ্র নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

বাসুদেব দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নাকাঙ্ক্ষী হইয়া, পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন, এবং কয়েক বৎসর প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া, ন্যায়শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন, ও অধ্যাপকের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সময়েই বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্র প্রচারের জন্য তাঁহার ঐকান্তিকী বাসনা

হইল; কিন্তু মৈথিলেরা ঐ শাস্ত্রে আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ভিন্নদেশ হইতে সমাগত ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্রের পুস্তক দেশে লইয়া যাইতে দিতেন না।

বাসুদেব দেখিলেন, বিনা পুস্তকে কোনও দেশে নূতন শাস্ত্র প্রচার করা অত্যন্ত কঠিন; এজন্য তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, পুস্তকগুলি আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া যাইবেন। এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া তিনি গঙ্গেশোপাধ্যায়প্রণীত চারি খণ্ড চিন্তামণি গ্রন্থ এবং কুসুমাঞ্জলির কারিকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। তিনি ক্রমাগত মূল গ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ করিতেছেন দেখিয়া, মৈথিল পণ্ডিতদিগের অত্যন্ত সন্দেহ হইল। তাঁহারা উঁহাকে আর কোনও পুস্তক দিলেন না; এবং যাহাতে তিনি স্বদেশে গিয়া আপন বাসনা পূর্ণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পক্ষধর মিশ্র বাসুদেবকে পরীক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করিলেন; এবং একখানি ন্যায়গ্রন্থ সম্মুখে রাখিয়া একটি লৌহশলাকা দ্বারা ঐ গ্রন্থের উপরিভাগ হইতে বিদ্ধ করিলেন। ঐ গ্রন্থের যে পত্রটি

সর্ব্বশেষে শলাকাবিদ্ধ হইল, তিনি বাসুদেবকে সেই পত্রের অর্থ করিতে বলিলেন। বাসুদেবের সমস্তই কণ্ঠস্থ ছিল, সুতরাং, ঐ পত্র আবৃত্তি করিতে ও ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। এইরূপে সাত আট বার শলাকাবিদ্ধ পত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, বাসুদেব আপন অধ্যাপককে এরূপ প্রীত করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে 'সার্ব্ব-ভৌম' এই উচ্চতম উপাধি প্রদান করিলেন। এই উপাধির অর্থ এই যে, ন্যায়গ্রন্থের সমস্ত ভূমিতে অর্থাৎ সকল স্থলেই বাসুদেবের সমান অধিকার হইয়াছে। তৎকালে ঐরূপে শলাকাবিদ্ধ করিয়া যে পরীক্ষা লওয়া হইত, তাহার নাম শলাকাপরীক্ষা। অতি অল্প লোকেই এই পরীক্ষায় বাসুদেবের ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন।

বাসুদেব অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত হইলেও, মৈথিলেরা তাঁহাকে কোনও পুস্তক লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে দিলেন না। এমন কি, তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিতে চেষ্টা করিলে, কেহ কেহ তাঁহার প্রাণবিনাশের জন্যও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া বাসুদেব অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং

আপাততঃ নবদ্বীপ গমনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ কাশী যাত্রা করিলেন।

তিনি দেশে আসিলেন না দেখিয়া, মিথিলা-বাসীরা তাঁহার উপর আর কোনও উপদ্রব করিল না। অনন্তর, তিনি কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন কালে, স্মৃতিপথে অঙ্কিত ন্যায়গ্রন্থগুলি একে একে লিখিয়া লইলেন; এবং কিছুদিনের মধ্যেই বেদান্তের পাঠসমাপ্ত করিয়া, নবদ্বীপে পুনরাগমন পূর্ব্বক ন্যায় শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী খুলিলেন। তাঁহার অধ্যাপনাকৌশলে মুগ্ধ হইয়া নানাদেশীয় ছাত্রবৃন্দ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তদবধি মহাসমারোহে বাঙ্গালা দেশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হইল।

বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থকারগণ, আপনা-দিগকে বাসুদেবের ছাত্র বলিয়া শ্লাঘা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি, স্মৃতি-সংগ্রহকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, তন্ত্রসংগ্রহকর্ত্তা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, এবং বৈষ্ণবমতপ্রবর্ত্তক চৈতন্যদেবও তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ছাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

এইরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে কার্য্য করিয়া বাসু-

দেব বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথম ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ও ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থকার হইয়া ভূয়সী খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, জীবনের শেষাংশে পুরুষোত্তমে অবস্থিতি করেন। চৈতন্যদেবও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলে, বাসুদেব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, কিছু দিন ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

রামগোপাল ঘোষ।

১২২১ সালে কলিকাতা মহানগরীতে কায়স্থকুলে রামগোপাল ঘোষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ সামান্যরূপ কর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে আপন পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন।

রামগোপাল পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পাঠ-শালায় প্রবিষ্ট হন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই, তৎকালপ্রচলিত পাঠশালার সমস্ত পাঠ সমাপন করেন। তদ্দর্শনে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভাল করিয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার মানসে সুপ্র-সিদ্ধ শের্বোর্ণ নামক সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। ঐ সময়ে, কলিকাতায় বালক-দিগকে ইংরাজী ভাষার শিক্ষাদান বিষয়ে, শের্বোর্ণ সাহেবেরই সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তৎকালে, এতদ্দেশীয় অনেকে ঐ সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া সুশিক্ষিত ও কার্য্যক্ষম হইয়াছিলেন।

শের্বোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয় স্থাপিত হই-বার অনেক দিন পরে, কতিপয় দেশহিতৈষী

বিদ্যোৎসাহী দেশীয় ও ইউরোপীয় মহানুভবের প্রযত্নে ও প্রভূত অধ্যবসায়ে হিন্দুকালেজ নামক এক ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। ঐ বিদ্যা-লয়ে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিত, তাহাদিগকে মাসিক ৫৲ টাকারও অধিক বেতন দিতে হইত। সুতরাং ধনশালী লোকের বালকগণই ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইত।

রামগোপাল অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। লেখাপড়া শিক্ষার জন্য তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ ছিল; এই কারণে স্বসম্পর্কীয়েরা তাঁহার পিতাকে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, রামগোপাল অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, ইহাকে যদি তুমি কিছু-কাল হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন করাইতে পার, তাহা হইলে, তোমার এই পুত্র দেশের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় লোক হইবে। যদিও রামগোপালের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না, তথাপি তিনি স্বীয় বন্ধুবান্ধবের নির্বন্ধাতিশয়ে রামগোপালকে হিন্দু-কালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। তৎকালে রাম-গোপালের বয়ঃক্রম প্রায় দশ বৎসর। তিনি হিন্দুকালেজে প্রবিষ্ট হইয়া নিরতিশয় যত্ন ও প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগি-

লেন। তাঁহার শিক্ষাবিষয়ে যত্ন ও আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, কালেজের শিক্ষকগণ ও অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। বিশেষতঃ বিদ্যোৎসাহী হেয়ার সাহেব মহোদয় রামগোপালের বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও ইংরাজী ভাষায় বিশুদ্ধরূপে কথাবার্ত্তা কহিবার ক্ষমতা অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে বিদ্যালয়ের অপর সকল বালক অপেক্ষা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

কিছু দিন পরে হেয়ার সাহেব রামগোপালের পিতার দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া, রামগোপালকে বিনা বেতনে কালেজে অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইহাতে রামগোপাল পরম আহ্লাদিত হইয়া, দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দুকালেজের যখন যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন সেই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কোনও ছাত্রই, কি ইংরাজী সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি গণিত, কি মনোবিজ্ঞান, কি দর্শন কোনও শাস্ত্রেই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তাঁহার বুদ্ধি সকল বিষয়েই তুল্যরূপে স্ফূর্ত্তি পাইত, কখনও কোনও বিষয়েই

প্রতিহত হইত না। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে, কালেজের শিক্ষকগণ তাঁহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কালেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রামগোপাল কালেজ পরিত্যাগ করিয়া, সাংসারিক কষ্ট নিবারণার্থ বিষয়কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন, এমন সময়ে, জোসেফ্ নামক এক ইহুদি সার্থবাহ, কোনও এক হৌসের একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবকে বলেন যে, আমার এক জন ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ইহা শুনিয়া, তিনি হিন্দুকালেজের কৃতবিদ্য এক ছাত্রকে জোসেফের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য কালেজের তত্ত্বাবধায়ক হেয়ার সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। হেয়ার্ সাহেব রামগোপালকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন,তজ্জন্য তিনি, তাঁহাকেই জোসেফের নিকট প্রেরণ করেন। জোসেফ্ও রামগোপালের কার্য্যদক্ষতা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। রামগোপাল ঐ কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার কিছুদিন পরে, জোসেফ্ তাঁহার হৌসের যাবতীয় কার্য্য-

ভার রামগোপালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

রামগোপাল প্রভুর ব্যবসায়ের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া তদীয় হৌসের যাবতীয় কার্য্যের উন্নতিসাধনের জন্য সাতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার সৌভাগ্য-ক্রমে ও অলৌকিক অধ্যবসায়ে হৌসের সকল কার্য্যেরই বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়াছিল। কিয়-দ্দিবস অতীত হইলে পর, তদীয় প্রভু ইউরোপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, রাম-গোপাল তাঁহার হৌসের সকল বিষয়েরই বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি রাম-গোপালকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্নেহ ও বিশ্বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে, কেল্‌সল্‌ নামক এক সাহেব জোসেফের সহিত ব্যবসায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। রামগোপাল ঐ হৌসের মুচ্ছদ্দীর পদে নিযুক্ত হইয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক সকল কার্য্য অবাধে সমাধা করিতেন। কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে পর, জোসেফ্‌ ও কেল্‌সলের পরস্পর মতভেদ হওয়ায় উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত

হয়েন। রামগোপাল তাঁহার পরম হিতৈষী আণ্ডার্সন্ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া কেল্‌সলের সহ কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি সমধিক যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, অভিনব প্রভুর সাতিশয় বিশ্বাস-ভাজন হইয়াছিলেন। অনন্তর, কয়েক বৎসর পরেই, রামগোপালও ঐ হৌসের অংশভাগী হইলেন, এবং ঐ হৌসের নাম "কেল্‌সল্ ঘোষ এণ্ড কোং" হইল।

এইরূপে তিনি হৌসের অংশ প্রাপ্ত হইয়া, বহু সম্মান ও বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। কিছুদিন পরে, তিনি বঙ্গদেশীয় বণিক সমিতির সভ্যপদে মনোনীত হয়েন। দরিদ্রসন্তান রামগোপাল এরূপ সম্মানের পদ প্রাপ্ত হইলেও, এবং অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেও, তাঁহার চালচলনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাঁহার যেরূপ প্রভূত ধনোপার্জ্জন হইতে লাগিল, তদুপযুক্ত ব্যয় করিতেও তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না।

১২৫৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বিঘ্নে ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। অতঃপর ইংরাজদের

ব্যবসায় কার্য্যের অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। এমন কি, অনেক ইংরাজবণিকের বাণিজ্য কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং রামগোপালেরও ব্যবসায় কার্য্যের ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। তিনি, আপন প্রাপ্য টাকার বিল বিলাতে প্রেরণ করেন, কিন্তু এদেশে ব্যবসায়ের বিবিধ অসুবিধানিবন্ধন সেই বিলের টাকা প্রাপ্ত হইবেন কি না, তদ্বিষয়ে তিনি সংশয়ারূঢ় হইয়াছিলেন। ঐ টাকা না পাইলে তাঁহাকেও একবারে পথের ভিকারী হইতে হইত, সন্দেহ নাই।

ঐ সময়ে, অনেকেই তাঁহাকে যাবতীয় সম্পত্তি (বেনামী) অর্থাৎ হস্তান্তরিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত উপদেশ দেন, কিন্তু উন্নতমনা, ধর্ম্মপরায়ণ, রামগোপাল ঐ পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বলিলেন, বিষয় হস্তান্তর করিয়া উত্তমর্ণকে বঞ্চনা করা অতি নীচের কার্য্য। ঋণপরিশোধার্থ যদি আমায় সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে হয়, তাহাও আমি করিব। অন্যান্য লোকের মত উত্তমর্ণকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য আমি কখনই বিষয় হস্তান্তরিত করিব না। এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইলে পর, সকলেই রামগোপালকে ধন্যবাদ দিতে

লাগিল। যাহাহউক, সৌভাগ্যক্রমে, তিনি বিলাত হইতে বিলের অনুযায়ী সমস্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেশীয় মহাজনগণের ঋণ-পরিশোধার্থ তাঁহাকে কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় নাই।

তদনন্তর কেল্‌সল সাহেবের সহিত মতভেদ হওয়ায়, রামগোপাল তাঁহার সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। ঐ সময়ে, তিনি আপন অংশের প্রাপ্য লাভস্বরূপ দুই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। অতঃপর রামগোপাল কিছুকাল কোনও বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন না। ঐ সময়ে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক সহস্র টাকা বেতনে, কলিকাতার ছোট আদালতে বিচারপতির পদে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী স্বীকার করিলে, তিনি, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাকালে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতে পারিবেন না; সুতরাং স্বদেশের হিতসাধন কার্য্যে তাঁহাকে বিরত থাকিতে হইবে, এজন্য, প্রথমতঃ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, পরে নিতান্ত অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে স্বীকার করেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপ হইতে আণ্ডার্সন্ সাহেব রামগোপালকে স্বয়ং হৌস করিতে পরামর্শ দেন; এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ও রামগোপালের নামে বিলাতে এক হৌস সংস্থাপিত করেন। ঐ হৌসের নাম "আর, জি, ঘোষ এণ্ড কোং" হইয়াছিল। ঐ ব্যবসায়ে তাঁহার উত্তরোত্তর প্রচুর অর্থো পার্জ্জন হইতে লাগিল। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যদক্ষতা ও সুজনতা প্রভৃতি গুণ-গ্রামে কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, সকল লোকেই বিমুগ্ধ হইতেন; বিশেষতঃ, তিনি উত্তমর্ণগণের সহিত সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন বলিয়া তাঁহার ব্যবসায়েরও উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছিল।

রামগোপাল বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যখন সর্ব্বপ্রথম বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখনও ক্ষণ-মাত্র সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া, বিদ্যানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। অবসর পাইলেই, তিনি, ইংরাজী ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন গ্রন্থ সমূহের অনুশীলন করিতেন; এবং প্রতিদিন, স্বকীয় ভবনে বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়া, নানা-বিধ উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী পুস্তকের আলো-

চনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি প্রতি শনি-বারে হিন্দুকালেজে উপস্থিত হইয়া, প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণের সহিত বিবিধ ইংরাজী সাহিত্য পুস্ত-কের চর্চ্চা করিতেন।

ঐ সময়ে "জ্ঞানান্বেষণ" নামে এক সংবাদপত্র, ও (রায় কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্বারা সম্পাদিত) বঙ্গদর্শন নামক অন্য এক সংবাদপত্র, প্রচারিত হইত। ঐ দুই সংবাদপত্রেই, তিনি, দেশীয় বাণিজ্য ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রবন্ধ লিখিতেন। তৎকালে নানাদেশ হইতে ব্যবসায়ের যে সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আনীত হইত, তাহার শুল্ক থাকা উচিত কি না? গবর্ণ-মেণ্ট যখন এ বিষয়ের আন্দোলন করেন, তখন রামগোপাল ঐ সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় দেখাইয়া সংবাদপত্রে বিস্তর প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রামগোপালের রচিত বাণিজ্যবিষয়ক প্রবন্ধ-গুলিতে সাধারণের সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। তৎকালীন উচ্চপদাভিষিক্ত রাজপুরুষেরা, দেশীয় লোকের অভিপ্রায় অবগতির জন্য, ঐ সংবাদপত্র যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিতেন, এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হইতেন।

ঐ সময়েই তিনি এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধু মিলিত হইয়া, কলিকাতা মহানগরীতে এক সভা সংস্থাপিত করেন। তথায় রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় নানাবিষয়ের সমালোচনা হইত। রামগোপাল এই সভার একজন প্রধান উদ্‌যোগী ও প্রধান বক্তা ছিলেন। কিছুকাল পরে, এই সভাই 'ব্রিটিষইণ্ডিয়ান সোসাইটি' নামে অভিহিত হয়। ঐ সভায় বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। তৎকালে ফৌজদারী আইনের একটি পাণ্ডুলিপি গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীনে ছিল; তাহাতে, সাহেব ও দেশীয়দিগকে একই নিয়মের অধীন করা উচিত, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। সাহেবেরা ইহাতে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এবং ঐ পাণ্ডুলিপি যাহাতে বিধিবদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে রামগোপালই একজন প্রধান উদ্‌যোগী, ইহা অবগত হইয়া, তাঁহার প্রতি সাতিশয় বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করেন। মহামতি রামগোপাল আত্মপক্ষ সমর্থন ও সাহেবদের অস্বাভাবিক ভাবের বর্ণন করিয়া এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। সাহেবেরা ঐ আইনকে "ব্ল্যাক্ য়্যাক্ট" বলিতেন।

রামগোপাল একজন বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ও হিন্দুসমাজের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তৎকালীন শিক্ষাসমাজের একজন সদস্য ছিলেন; পরে কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের ও কৃষিতত্ত্ববিষয়ক সমিতির এবং ব্রিটিষইণ্ডিয়ান্ এসোসিএসনের সদস্য পদে নিযুক্ত হন। অনন্তর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি তাহারও একজন সভ্য হইয়াছিলেন। রামগোপাল ১৮৬১ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে মনোনীত হয়েন।

অনেক দরিদ্র বালক তাঁহার অর্থসাহায্যে লেখা পড়া শিখিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিল। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ, তিনি, কখনও স্বর্ণপদক, কখনও বা বহুমূল্য পুস্তকাদি, এবং কখনও বা প্রচুর অর্থ, পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিতেন।

শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ দেশহিতৈষী মহামতি বেথুন সাহেব, ভারতবর্ষের অবলাগণের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণ মানসে, সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় এক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত করেন। দৃঢ়মতি রামগোপাল ঐ বিদ্যালয়ে স্বীয় দুহিতাকে

বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দেন; তন্নিমিত্ত হিন্দুসমাজে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ঐ সময়ে গবর্ণর জেনারল বাহাদুর ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত, তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সৌহৃদ্য ছিল। এজন্য, যখন যে স্থানে কোন প্রকার রাজনীতি-সম্বন্ধীয় সভার অধিবেশন হইত, তথায় রাম-গোপাল আহূত হইতেন; এবং তিনিও স্বীয় অসাধারণ বাগ্মিতা দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিয়া নিজ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতেন।

১২৬০ সালে, কোম্পানির সনন্দ পরিবর্ত্তনের এবং ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালী সংশোধনের প্রস্তাব সময়ে দেশীয়দিগকে ভারতবর্ষীয় "সিভিল সার্ভিস" পদে নিযুক্ত করা উচিত কি না? পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এতদ্বিষয়ের আন্দোলন হইলে, কোনও বিখ্যাতনামা সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা কালে ঐ বিষয়ের যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, যে, দেশীয় কৃতবিদ্যগণকে ঐ পদ প্রদান করিলে, ইংরাজদের শত্রুবৃদ্ধি করা হইবে। এতচ্ছ্রবণে সুবিজ্ঞ রামগোপাল টাউনহলে এক

সভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় দেশীয় বহু-সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক সমুপস্থিত হইলে পর, তিনি ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষিতগণের 'সিভিলসার্ব্বিস' পদ পাওয়া উচিত, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, এক হিতগর্ভ ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন; এবং ভারতবাসীদিগকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিয়া উচ্চপদ লাভে বঞ্চিত করা যে, রাজনীতিবিরুদ্ধ, ইহা তিনি সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেন।

তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই পরম আহ্লাদিত হয়েন; সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর রামগোপালকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন, "তুমিই আমাদের দেশের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী ও দেশীয় লোকের ভূষণস্বরূপ। সম্প্রতি তোমার তুল্য সদ্বক্তা ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আর কেহই নাই। তুমি এইরূপে চিরদিন স্বদেশের হিতসাধন কর।"

পরে ঐ সকল বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া দেশ বিদেশে প্রেরিত হয়। তদানীন্তন সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা রামগোপালের বক্তৃতা স্বীয় স্বীয় সংবাদপত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন; এবং তদীয় স্বদেশহিতৈষিতা ও রচনাশক্তির

ওজস্বিতা প্রভৃতি গুণ সমূহের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ফলতঃ, কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ইংরেজী ভাষায় এরূপ বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা অদ্যাপি আর কোনও ভারতবাসীর হয় নাই। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীরা ঐ বক্তৃতা পাঠ করিয়া, ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হন।

ঐ সময়ে, কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিটী, নিমতলার ঘাটে যে শবদাহ হয়, তৎপরিবর্ত্তে, দূরবর্ত্তী অন্য এক স্থান মনোনীত করেন। এই সংবাদে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকমাত্রেই ধর্ম্মলোপ হইবার আশঙ্কায় অতিশয় ব্যাকুল হন। হিন্দুদের ভীত হইবার প্রধান কারণ এই যে, কলিকাতার দক্ষিণাংশে অতি দূরে শবদাহের ঘাট নির্দ্ধারিত হইলে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে; কিন্তু মিউনিসিপাল কমিটী তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। কলিকাতাবাসী হিন্দুগণ স্বধর্ম্মলোপকর এই আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রামগোপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিও দেশীয় হিন্দুগণের মানসিক কষ্ট

নিবারণার্থ, বদ্ধপরিকর হইয়া, স্বীয় ওজস্বিনী বক্তৃতাদ্বারা, অখণ্ড্য যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক মিউ-নিসিপাল কমিটীর ভ্রম দেখাইয়া দিলেন; এবং তাঁহাদিগকে প্রস্তাবিত বিষয়টি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এজন্য, কলিকাতাবাসী শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই অদ্যাপি সেই মহানুভব রামগোপা-লের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন।

রামগোপাল নিরন্তর দেশহিতকর কার্য্যে যত্নবান্ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে লৌহবর্ত্ম প্রচলনজন্য ঐ বিষয়ের অনুষ্ঠাতৃগণের সহিত যোগ দেন, এবং দেশীয় লোকের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব-প্রথমে লৌহবর্ত্ম কোম্পানির অংশ ক্রয় করেন।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় বঙ্গদেশীয় লোকেরা বিদ্রোহিগণের সহিত যোগ দিয়াছিল বলিয়া, গবর্ণমেণ্টের যে ভুল সংস্কার জন্মিয়াছিল, রাম-গোপাল তাঁহাদের চিত্তপট হইতে তাহা অপনয়-নার্থ সাতিশয় যত্ন পাইয়াছিলেন।

তিনি গর্ভধারিণীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করি-তেন। জননী যাহাতে সন্তুষ্টা হন, তদ্বিষয়ে সাতি-শয় যত্নবান ছিলেন।

রামগোপাল অতিশয় অমায়িক, সুশীল, সত্য-

বাদী ও নিরহঙ্কার ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বসম্পর্কীয় ও বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহারাও সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করিতেন, এবং কথোপকথন সময়ে কখনও আত্মশ্লাঘা করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, কেহ কখনও তাঁহার নিকট আসিতে সঙ্কুচিত হইত না।

তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে যাবতীয় সম্পত্তির বিনিয়োগ করিয়া যান। তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকারও অধিক। তন্মধ্যে, তাঁহার বিধবা পত্নী ও অন্যান্য পরিবারদিগের ভরণপোষণার্থ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিংশতি সহস্র মুদ্রা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্তারিংশৎ সহস্র মুদ্রা অর্পণ করেন; এতদ্ভিন্ন স্বসম্পর্কীয় ও বন্ধুবান্ধবগণকে, যে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা ঋণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিয়া যান।

১২৭৫ সালে বাগ্মিপ্রবর রামগোপাল ঘোষ চতুরধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, কলেবর পরিত্যাগ করেন।

গদাধর ভট্টাচার্য্য।

বগুড়া জেলায় লক্ষ্মীচাপড় নামে একটী সামান্য গ্রাম আছে। প্রায় দুই শত বর্ষ অতীত হইল, তথায়, অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন, অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, গদাধর ভট্টাচার্য্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জীবানন্দ পাঠক (ভট্টাচার্য্য)।

গদাধর অষ্টম বর্ষবয়ঃক্রম কালে পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, এবং যত্ন ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিয়া কতিপয় বৎসরের মধ্যেই, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও পুরাণ সমূহ, অধ্যয়ন করিয়া, অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পাঠাবস্থাতেই, তিনি ঐ সকল শাস্ত্রের বিচারে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতেন।

উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়াও, গদাধরের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হয় নাই। তিনি, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য মানস করেন; কিন্তু তৎকালে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে নবদ্বীপেই

ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত; এজন্য তিনি নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৎকালে নবদ্বীপে নৈয়ায়িকগণের মধ্যে হরিরাম তর্কসিদ্ধান্তেরই সবিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য ছিল। নানা দেশ হইতে ছাত্রসমূহ আসিয়া তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তজ্জন্য গদাধরও তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নার্থ প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় তিনি, কয়েক বৎসর অহর্নিশ সাতিশয় যত্ন ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিয়া, ঐ ন্যায়শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

তদীয় অধ্যাপক মধ্যে মধ্যে, যখন দেশবিদেশে অধ্যাপকসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া যাইতেন, তখন গদাধরও তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতেন। তথায় তিনি বিচারে সভাস্থ নৈয়ায়িক পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করিতেন। গদাধরের অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। তাহার বলেই তিনি পণ্ডিতসভায় বিচারে কখনও পরাজিত হইতেন না। পণ্ডিতগণ গদাধরের সহিত বিচার করিতে ভীত হইতেন। তদীয় অধ্যাপক গদাধরের অলৌকিক বুদ্ধি, অলৌকিক বাক্পটুতা, ও অলৌকিক তর্ক-

শক্তি দেখিয়া বলিতেন যে, আমার অবর্ত্তমানে গদাধর নবদ্বীপের নাম রাখিতে পারিবে।

কিয়দ্দিবস পরে, গদাধর পাঠ সমাপন ও উপাধিগ্রহণ না করিয়াই কোনও বিশেষ কার্য্য-বশতঃ স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ঐ সময়ে তদীয় অধ্যাপক হরিরাম তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার দেহাত্যয়ের পূর্ব্বে, তদীয় সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "উপযুক্ত সন্তানাদি নাই, তোমার চতুষ্পাঠী কে রক্ষা করিবে"। ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করেন, "আমার ছাত্রবর্গের মধ্যে গদাধর অসামান্য বুদ্ধিমান্। যদিও তাহার পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, কিন্তু তাহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ; সে অবাধে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনায় সমর্থ হইবে; অতএব "তুমি আমার অবর্ত্তমানে গদাধরকেই আমার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিবে, ইহার অন্যথা না হয়"।"

হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত লোকান্তরিত হইলে বিদ্যোৎসাহী নবদ্বীপাধিপতি অনুসন্ধান দ্বারা সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন, এবং লক্ষ্মীচাপড় গ্রাম হইতে গদাধরকে আনয়ন পূর্ব্বক, ঐ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

গদাধর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু কোনও বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে স্বীকার করিল না।

তৎকালে প্রথা ছিল যে, অধ্যাপক বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কেহ উপাধিধারী বা গ্রন্থকর্ত্তা না হইলে, সহসা কোনও বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিতে সম্মত হইত না। গদাধরের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কেহই উপাধিধারী অধ্যাপক বা গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন না, এবং তিনিও কোনও উপাধি প্রাপ্ত হন নাই; এই হেতু বশতঃ তদীয় উপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠীতে যে সকল ছাত্র উপস্থিত ছিল, তাহারা গদাধরের নিকট অধ্যয়ন করিতে অসম্মত হইয়া, তৎকালীন অতি বৃদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার ও অন্যান্য অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া, তাঁহার মনোমধ্যে অত্যন্ত দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এতাবৎ কাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, যে দুর্ব্বোধ ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিলাম, কোনও বিদ্যার্থী যদি আমার নিকট তাহা অধ্য-

য়ন করিতে সম্মত হইল না, তবে আমার সকলই নিষ্ফল। এত দিন আশা করিয়াছিলাম যে, দেশীয় বিদ্যার্থীদিগকে নূতন প্রণালীতে অতি সহজে গল্পচ্ছলে ও কৌশলে দুরূহ ন্যায়শাস্ত্র শিখাইব, এবং দেশের মধ্যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ অপেক্ষা সমধিক প্রশংসার ভাজন হইব। এই প্রত্যাশায় আমি দুর্ব্বোধ ন্যায়শাস্ত্রের কত প্রকার টীকা ও টিপ্পনী প্রস্তুত করিয়াছি ও করিতেছি; তাহা যদি অন্তেবাসিগণকে অধ্যয়ন করাইতে না পারিলাম, তাহা হইলে সকলই পণ্ড হইল।

গদাধর অতি অধ্যবসায়শীল ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। এইরূপ দুর্ঘটনাতেও তিনি ভগ্নোদ্যম না হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত বিদ্যার্থিগণ আমার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় না পায়, সে পর্য্যন্ত কেহই আমার নিকট অধ্যয়ন করিতে সম্মত হইবে না। অবশেষে তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিলেন, এবং ভাগীরথীতীরে সাধারণের স্নান করিতে যাইবার পথপার্শ্বে একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করাইয়া, ঐ পুষ্পোদ্যানের মধ্যে স্বীয় চতুষ্পাঠী গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। তথায় প্রাতঃ

কাল হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পুষ্পবৃক্ষের সমীপে উপবেশন করিয়া, একাকী ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। তিনি পুষ্পবৃক্ষকে ছাত্র-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, সম্বোধনপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ করিতেন, এবং স্বয়ংই, ঐ পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা করিতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল।

অন্যান্য চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ, প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ স্থান দিয়া পুষ্পচয়ন ও গঙ্গাস্নান করিতে যাইত। তাহারা পথের পার্শ্বে গদাধরের নূতন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া, প্রতিদিন পুষ্পচয়ন করিত এবং পুষ্পবৃক্ষকে ছাত্র করিয়া গদাধর ন্যায়শাস্ত্রের যে তর্কবিতর্ক করিতেছেন, একতান মনে শ্রবণ করিত ও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিত তাঁহার অধ্যাপনা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে নূতন। অচিরেই এই সংবাদ নবদ্বীপবাসী সাধারণের শ্রুতিগোচর হইল। নবদ্বীপের সকল চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, পুষ্পচয়নব্যপদেশে গদাধরের পুষ্পোদ্যানে সমুপস্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে গদাধরও ন্যায়শাস্ত্রের অতি কঠিন কঠিন স্থলগুলি অতি সহজরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, স্বীয় অভিপ্রায় পত্রনিহিত করিতেন;

ইহা অবলোকন করিয়া ছাত্র সকল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া যাইত। অনন্তর, কোনও কোনও ছাত্র অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট পাঠ-স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ছাত্র পাঠার্থী হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার যশঃ-শশাঙ্ক সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইল। এত দিনের পর স্থিরমতি গদাধরের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি অসংখ্য অন্তেবাসীকে আন্তরিক যত্নের সহিত বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। জগদীশ তর্কা-লঙ্কারের দেহত্যাগের পর, গদাধরই নবদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া-ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণির প্রণীত যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, সেই সকল গ্রন্থের ভাব অতি গূঢ়। টীকার সাহায্য ব্যতীত উহাদের অর্থবোধ হওয়া দুষ্কর; এজন্য গদাধর বিদ্যার্থি-গণের পাঠসৌকর্য্যার্থে ঐ গ্রন্থ সমূহেরই টীকা রচনা করিয়াছেন। গদাধর যে সমস্ত টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহা অতি প্রাঞ্জল। তাঁহার

প্রণীত টীকা, 'গাদাধরী' নামে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ আছে।

গদাধর নানাদেশ হইতে, বহুবিধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং, নানাশাস্ত্রে তাঁহার বহুদর্শিতা জন্মিয়াছিল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ গদাধর ন্যায়-শাস্ত্রের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসুদ্ধ ষাটিখানি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিয়া, ভারতবর্ষে অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। যতদিন পৃথিবীতে সংস্কৃত তর্কশাস্ত্রের আলোচনা থাকিবে, ততদিন গদাধরের নাম বিলুপ্ত হইবে না। তাঁহার কৃত ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে, পণ্ডিত লোকদিগেরও চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ সময় অতিবাহিত হয়।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী রাধানগরনামক গ্রামে ১৮২৫ খৃঃ অব্দে, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী। তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন সুপ্রসিদ্ধ কুলীন কায়স্থ ছিলেন। যদুনাথের প্রথম পরিণীতা পত্নীর গর্ব্ভে চারি পুত্র ও দুই কন্যা হয়। তন্মধ্যে, প্রসন্নকুমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

প্রসন্নকুমার পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্বগ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন। তথায় তিনি যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই শুভঙ্করী অঙ্ক ও বাঙ্গালাভাষায় সুশিক্ষিত হয়েন। বাল্যকালে তিনি অতি সুশীল ও সুবোধ ছিলেন। অন্যান্য বালকগণের মত দুষ্ট ও চঞ্চলস্বভাব ছিলেন না; এজন্য গুরুমহাশয় পাঠশালার সকল ছাত্র অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন।

তিনি পাঠশালার পাঠসমাপন করিয়া, বাটীর অতি সন্নিহিত রঘুনাথপুরনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ রমা-

প্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট, সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

কিছুদিন পরে, প্রসন্নকুমারের পিতামহ মথুরামোহন সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাকে রীতিমত ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য, কলিকাতার অদূরস্থ খিদিরপুরে লইয়া যান। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রাজা সীতানাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের যত্নে, তিনি কলিকাতার হিন্দুকালেজে প্রবিষ্ট হন।

ঐ সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র। প্রসন্নকুমারের আবাসস্থান হইতে ঐ বিদ্যালয় দুই ক্রোশ পথের ন্যূন নহে। এই সুদীর্ঘ পথ গমনাগমন কালে, তিনি বহুসংখ্যক পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ অনেক দূর যাতায়াত করায় ও বয়ঃপরিমাণে যেরূপ শ্রম করা উচিত, পাঠাভ্যাসে তদপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম করায়, তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়। এজন্য তিনি, খিদিরপুর পরিত্যাগ করিয়া শ্যামবাজারস্থ এক আত্মীয়ের ভবনে অবস্থিতি করেন। লেখা পড়া শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ যত্ন ও অধ্যবসায় ছিল। বাটীর সকলে নিদ্রিত হইলে পর, প্রসন্নকুমার

অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া, মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠাভ্যাস করিতেন। তিনি আলোর অভাবে, মধ্যে মধ্যে বাটীর বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, বহির্দ্বারস্থ লণ্ঠনের আলোকে অধ্যয়ন করিতেন, এবং কখনও কখনও দীপাভাবে নিশীথ সময় পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নালোকেও অধ্যয়ন করিতেন।

তিনি, কালেজে যখন যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন সেই শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রধান বৃত্তি ও প্রধান পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। কালেজের সাহেব শিক্ষকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কি সাহিত্য, কি গণিত, কি দর্শন, কি পদার্থবিদ্যা, কি পুরাবৃত্ত কোন শাস্ত্রেই প্রবেশার্থ তাঁহার বুদ্ধির গতি প্রতিহত হইত না।

হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন কালে, মুরশিদাবাদের নবাব ঐ কালেজ পরিদর্শন করিতে আইসেন, এবং বিত্থার্থিগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ, এক সহস্র টাকার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। প্রসন্নকুমার উহা হইতে পঞ্চবিংশতি স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

ঐ সময়ে রাজা সীতানাথ বসু সর্ব্বাধিকারী

মহাশয় মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেও-য়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে, ঐ বসু মহাশয় বঙ্গদেশের মধ্যে দেশীয় সকল কর্ম্মচারী অপেক্ষা অধিক বেতন পাইতেন। তিনি অবসর-গ্রহণেচ্ছু হইয়া, কৃতবিদ্য ভ্রাতুষ্পুত্র প্রসন্ন-কুমারকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগী প্রসন্নকুমার বিদ্যাচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইতে সম্মত হইলেন না।

তৎকালীন, কালেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক রীজ সাহেব, স্বীয় ছাত্রগণকে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ এবং গ্রহনক্ষত্রাদির গণনা বিষয়ে প্রশ্ন করি-তেন। প্রসন্নকুমার দুরূহ জ্যোতিষের গণনায় অভ্রান্ত হইয়া উঠেন; তজ্জন্য রীজ সাহেব তাঁহাকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন। প্রসন্নকুমার ইংরাজি সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, কালেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। অধিক কি, প্রসন্নকুমার তাঁহার ছাত্র ছিলেন বলিয়া, তিনি আপনার ও কালেজের শ্লাঘা জ্ঞান করি-তেন, এবং কালেজের ছাত্রদিগকে প্রসন্ন-

কুমারের উদাহরণ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেন।

ঐ সময়ে জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ব্যতীত লাইব্রেরী পরীক্ষা নামে এক পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। ঐ পরীক্ষায় কালেজের পুস্তকালয়স্থিত কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি গণিত, কি ইতিহাস, কি জীবনচরিত, সমস্ত বিষয়েরই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইত। তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি কালেজ পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন পারসী ভাষা শিক্ষা করেন।

তৎকালীন, শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ মহামতি বেথুন সাহেব প্রসন্নকুমারকে মধ্যে মধ্যে আপন বাটীতে আহ্বান করিতেন, এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইতেন।

তৎকালের উচ্চপদাভিষিক্ত রাজপুরুষেরা, প্রসন্নকুমারের বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক্ পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত উপদেশ দেন; কিন্তু তাঁহার ঐ ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইবার প্রবৃত্তি হইল না।

অতঃপর কোনও বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া

উচিত বিবেচনায়, প্রসন্নকুমার প্রথমতঃ লবণ সম্পর্কীয় কার্য্যের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে ঐ পদ উঠিয়া গেল। তখন, তিনি ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান সভার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া, অতি অল্পদিন মাত্র কার্য্য করেন। পরে ঢাকা কালেজে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তিনি সাধারণের নিকট প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন; এবং ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় হিন্দুকালেজের শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবিষ্ট হন।

ঐ সময়ে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রসন্নকুমার প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রসন্নকুমারের নিকট ইংরাজী ভাষার উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য ও দর্শন গ্রন্থের অনুশীলন করিতেন। তিনি প্রসন্নকুমারকে বলেন যে, সংস্কৃত কালেজে ইংরাজী শিক্ষা ভাল হয় না; সাধারণের এই প্রতীতি দূরীকরণার্থ একবার বিশিষ্টরূপ প্রয়াস পাইতে হইবেক।

এই হেতু, প্রসন্নকুমার হিন্দুকালেজে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে, হিন্দুকালেজের অবকাশের পর, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তৎকালের সংস্কৃত কালেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রভৃতিকে যত্নপূর্ব্বক ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করাইতেন। তন্নিবন্ধন কয়েক মাসের মধ্যে ঐ কয়েক জন ছাত্র উভয় ভাষাতেই বিশুদ্ধরূপে অনুবাদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং রীতিমত উচ্চারণ ও আবৃত্তি করিতে পারিতেন। শিক্ষাদান বিষয়ে, প্রসন্নকুমারের সবিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়া, তৎকালে অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে হিন্দুকালেজের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সংস্কৃত কালেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময়ে, সংস্কৃত কালেজে ইংরাজী অধ্যয়ন করা আর না করা ছাত্রগণের ইচ্ছাধীন ছিল ; কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহাশয় শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই সকল ছাত্রই ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময়ে বাঙ্গালাভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তক অধিক ছিল না। সাধারণের হিতকামনায় সর্ব্বাধিকারী

মহাশয় তাঁহার উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজী ও সংস্কৃত পুস্তক, দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনিই, তাঁহার তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান ছাত্র তারা-শঙ্কর তর্করত্নকে ইংরাজী রাসেলাস ও সংস্কৃত কাদম্বরীর বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে উপদেশ দেন। তারাশঙ্কর তাঁহারই উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া, ঐ গ্রন্থ দ্বিতয়ের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। প্রসন্নকুমার ঐ অনুবাদ আদ্যন্ত দেখিয়া অসংলগ্ন স্থান সমূহের পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে পর, তারাশঙ্কর তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সাহস করেন।

গবর্ণমেণ্ট মফঃস্বলে বাঙ্গালা বিদ্যালয় সং-স্থাপিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, প্রসন্ন-কুমার দেখিলেন, শুভঙ্করী ব্যতীত আর কোনও পাঠোপযোগী অঙ্কপুস্তক বাঙ্গালা দেশে নাই। এজন্য তিনি এই অভাব বিমোচনার্থ, নানাবিধ ইংরাজী অঙ্কপুস্তক এবং সংস্কৃত লীলাবতী ও বীজ-গণিত প্রভৃতি পুস্তক অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পাটীগণিত ও বীজগণিত নামক পুস্তকদ্বয় মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

যদিও সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আর কোন পুস্তক

রচনা করেন নাই; কিন্তু পাটীগণিত ও বীজ-গণিত প্রকাশ করাতেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত গণিতপুস্তকদ্বয় প্রকাশিত হইবার বহুদিন পরে, অনেকেই অঙ্ক-পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু, প্রসন্ন-কুমার সর্ব্বপ্রথম গণিতশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ-গুলির উদ্ভাবন করেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত শব্দই ব্যবহার করিতেছেন।

প্রথমবারের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রসন্নকুমারের ছাত্রগণ অন্যান্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিত প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিল; তাহাতে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ও শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন প্রসন্নকুমারের ঐকান্তিক যত্নেই সংস্কৃত কালেজে এফ্‌এ ও বিএ, ক্লাস খোলা হয়, এবং সংস্কৃত কালেজ সর্ব্বাংশেই প্রথম শ্রেণীর কালেজরূপে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের উন্নতির সহিত প্রসন্ন-কুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরও পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিএ, ক্লাস খুলিবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ যে এরূপ ইংরাজী

শিক্ষা করিতে পারিবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। ইহা যে, কেবল প্রসন্নকুমারের শিক্ষাদাননৈপুণ্যে ও আন্তরিক প্রযত্নেই হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগী প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী অতি তেজস্বী লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত কালেজ ও প্রেসিডেন্সি কালেজ একই বাটীতে অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত কালেজের দ্বিতলস্থ একটি গৃহে বহুসংখ্যক হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তক রক্ষিত হইত। তৎকালে, পৃথিবীর আর কোনও স্থানে এত অধিকসংখ্যক হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তক ছিল না। প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয় আপন কার্য্যসৌকর্য্যার্থ হস্তলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নতলের গৃহে পাঠাইয়া ঐ গৃহটী গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। নিম্নতলে এই পুস্তকগুলি নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বলিয়া, প্রসন্নকুমার তাহাতে বিশেষ আপত্তি করেন, কিন্তু উপরিতন কর্ম্মচারী মহোদয় তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ঐ গৃহ প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ শর্টক্লিফ্ সাহেব মহাশয়কে প্রদান করেন।

আপনার ন্যায়ানুগত আপত্তি গ্রাহ্য হইল না

দেখিয়া ও অমূল্য গ্রন্থরত্ন নষ্ট হইয়া যাইবে, এই ক্ষোভে, তেজস্বী প্রসন্নকুমার পদত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বেতন তিন শত টাকা এবং পেন-সনেরও সময় নিকটবর্ত্তী। কিন্তু তিনি নিজের সম্মান ও অমূল্য গ্রন্থরত্ন রক্ষার জন্য আপন স্বার্থের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলেন না। যাহা হউক, তাঁহার পদত্যাগের কিছুদিন পরে, ঊর্দ্ধতন কর্ম্ম-চারী মহোদয়েরা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে পুনরায় স্বপদে নিযুক্ত করি-লেন, এবং তাঁহার ওজস্বিতায় ও কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া, তাঁহার বেতনবৃদ্ধির জন্য গবর্ণ-মেণ্টের নিকট অনুরোধ করিলেন। তাঁহার বেতন ক্রমশঃ সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

প্রসন্নকুমার কিছুদিনের জন্য বহরমপুর কালে-জের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। রাজসাহী বিভাগের প্রতিনিধি স্কুলইনস্পেক্টারের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধানার্থ তাঁহাকে প্রায় মফঃস্বলে পরিভ্রমণ করিতে হইত; একারণ, ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেসিডেন্সি কালে-

জের সহকারী ইংরাজী সাহিত্যের ও ইতিবৃত্তের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

প্রসন্নকুমারের পিতৃভক্তি অতি প্রবল ছিল। তিনি পিতাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। পিতার অনুমতি ব্যতীত কখনও কোনও কার্য্য করিতেন না। তিনি সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন ও ভ্রাতৃগণকে আপনার নিকট রাখিয়া, যাহাতে তাহারা সকলে ভালরূপ লেখা-পড়া শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন।

প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া, ঐ কালেজের ছাত্রদিগের সহিত সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। কোনও ছাত্র বা শিক্ষক পীড়িত হইলে, তিনি, তাঁহার সহোদর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিতে প্রেরণ করিতেন, এবং দরিদ্রছাত্রদের ঔষধের জন্য সূর্য্য-কুমারের নামে অনুরোধ পত্র প্রদান করিতেন। তিনি সংস্কৃত কালেজের অনেকগুলি ছাত্রের বেতন দিতেন। ইহাতে তাঁহার প্রতিমাসে প্রায় ৭৫৲

টাকা ব্যয় হইত, কিন্তু এ কথা তাঁহার বাটীর কেহই জানিতে পারিত না।

তিনি আপন পদের কখনও গৌরব করিতেন না। কালেজের মধ্যে কোনও অধ্যাপক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করিতেন। তাঁহার সৌজন্যাদি গুণগ্রামে কালেজের কি ছাত্র, কি অধ্যাপক, সকলেই পরম আহ্লাদিত হইতেন।

তিনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী ও দয়ার্দ্রচেতা ছিলেন। বাল্যকালে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসিয়া যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন; এজন্য, তিনি দেশস্থ দরিদ্র-সন্তানদিগকে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মত কষ্ট পাইতে না হয়, এতদভিপ্রায়েই জন্মভূমি রাধানগর গ্রামে সংস্কৃত কালেজের প্রণালী অনু-সারে নিজ ব্যয়ে এক উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী সংস্কৃতবিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। এই বিদ্যা-লয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে মাসিক দুই শত টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইত। তিনি দেশে গমন করিলে, কি দরিদ্র, কি ধনী, সকল শ্রেণীর লোকের ভবনে তত্ত্বাবধান করিতে যাইতেন।

প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও কোন সাংসারিক কষ্টের কথা শুনিলে, সাহায্য করিয়া, তাহার কষ্ট নিবারণ করিতেন। দেশস্থ যে সকল দরিদ্র-সন্তান, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, অর্থাভাবে কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া উচ্চ শিক্ষা করিতে সমর্থ না হইত, তিনি ঐ সকল দরিদ্র-সন্তানকে কলিকাতায় স্বকীয় আবাসে রাখিয়া সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া দেশস্থ সকলে পরম প্রীত হইত।

তিনি মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন পাইতেন ও পাটীগণিত এবং বীজগণিত পুস্তক দ্বয় বিক্রয় দ্বারাও তাঁহার প্রচুর লাভ হইত, কিন্তু, তিনি মৃত্যুকালে পরিবারবর্গের জন্য কিছুই সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিংশতি মাস পেন্সন উপভোগ করিয়া ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ৫ই নবেম্বর দ্ব্যধিক ষষ্টীতম বর্ষবয়ঃক্রম কালে পরলোক গমন করেন।

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে যাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে, তাঁহার ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিত বাঙ্গালাদেশে অতি বিরল। কিন্তু তাঁহার সময়ে ইংরাজী বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ও সেই সঙ্গে সংস্কৃতের আদর হ্রাস হওয়ায়, অনেকেই তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত নহেন। ১২৭৪ সালে তাঁহার দেহাত্যয় হইয়াছে। তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অদ্যাপি জীবিত আছেন। যে কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বিদ্যাবত্তা, উদারতা ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি কাব্য, নাটক, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বের মত সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা থাকিলে, তৎ-প্রণীত গ্রন্থেরও বহুলপ্রচার থাকিত, এবং তাঁহার নামও প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইত।

এই মহাত্মা ১২০৪ সালে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবেলঘুরিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকিশোর তর্কালঙ্কার। তৎকালে, তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র ব্যবসায়ী অধ্যাপক ছিলেন। নানা দেশ হইতে সমাগত ছাত্রমণ্ডলী তাহার চতুষ্পাঠীতে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত।

শিবচন্দ্র পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া সপ্তম বর্ষ বয়সে পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অলোকসামান্য স্মরণশক্তি ছিল; সেই শক্তি বলে তিনি, দশ বর্ষ বয়সের মধ্যেই দুরূহ পাণিনি ব্যাকরণের পাঠ সমাপন করিয়া, ব্যাকরণ শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে, তিনি অসাধারণ যত্ন ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে ষোড়শ বর্ষ বয়সের মধ্যেই কাব্য, অলঙ্কার, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ, ন্যায় এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশিষ্টরূপ পারদর্শিতা লাভ করেন, এবং নানা স্থানে অধ্যাপকসভায় বিচারে জয়লাভ করেন। তৎকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন পণ্ডিতেরাও তাঁহার সহিত বিচার করিতে অত্যন্ত ভীত হইতেন। শিবচন্দ্রের কূটতর্কে সভাস্থ সকল পণ্ডিতকেই ভয়ে স্তম্ভিত হইতে হইত। এত অল্প বয়সে এরূপ বিদ্যো-

পার্জ্জন করিতে প্রায় দেখা যায় না; এই হেতু, তৎকালে অনেকে মনে করিতেন যে, শিবচন্দ্র ঈশ্বরানুগৃহীত লোক। কেহ কেহ বলিতেন, শিবচন্দ্রের দৈব বিদ্যা।

সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি আপন গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে পাণিনি ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিদ্যার্থিগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া অধ্যয়নার্থ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যদিও শিবচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার অনেক ছাত্রের বয়ঃক্রম অধিক ছিল, তথাপি তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। অধ্যাপনা বিষয়ে শিবচন্দ্রের অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

নিকটবর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণ, একজন বালকের এতাদৃশ অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন। কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়া শিবচন্দ্র দেখিলেন যে, সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার অনন্ত। তিনি উহার অতি সামান্য অংশ মাত্র আয়ত্ত করিতে

সমর্থ হইয়াছেন। এইরূপ ধারণা হইবামাত্র, তিনি দর্শনাদি নানাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের জন্য স্বীয় চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীযাত্রা করিলেন। তৎকালে কাশী গমন করা অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। তখন রেলের পথ হয় নাই। পথে দস্যু ও হিংস্র জন্তুর অতিশয় ভয় ছিল, তথাপি শিবচন্দ্র সাহসাবলম্বন করিয়া ঐ বয়সে একাকী বিদ্যা শিক্ষার্থ পদব্রজেই কাশীধামে উপস্থিত হইলেন।

তৎকালে রামকৃষ্ণ মিশ্র কাশীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাকারাম শাস্ত্রী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। শিবচন্দ্র তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা বাপুদেব শাস্ত্রী কাকারামের অন্যতর ছাত্র ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে সর্ব্বদাই কহিতেন, শিবচন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান ও উৎসাহশীল ছাত্র আর কখনও দেখেন নাই। তিনি আরও বলিতেন, "শিবচন্দ্রের বুদ্ধি হীরার ধার, শিবচন্দ্রের কৃত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করে কাহার সাধ্য, কাকারাম শাস্ত্রীও কোনও কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্থির হইতেন।" কাশীতে অবস্থান কালে শিবচন্দ্র সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত

ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ছিল। তাঁহার লিখিত সংস্কৃত কবিতাগুলি অতি প্রাঞ্জল।

কাশীতে অধ্যয়ন কালে শিবচন্দ্র অধ্যাপকের সমভিব্যাহারে পঞ্জাব, কাশ্মীর, পুনা, গুজরাট, মিথিলা, নেপাল, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা জনপদে যাইয়া আপন বিদ্যাবত্তায় তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তদীয় উপাধ্যায় কাকারাম শাস্ত্রী শিবচন্দ্রের সকল শাস্ত্রে মীমাংসা করণের অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখিয়া, পরম আহ্লাদিত হইয়া, শিবচন্দ্রকে সিদ্ধান্ত উপাধি প্রদান করেন। তিনি পাঁচ বর্ষ কাল অলৌকিক অধ্যবসায় সহকারে বেদান্ত, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, জ্যোতিষ প্রভৃতি শিক্ষা করেন এবং পাঠ সমাপনান্তে কাশী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় বৈদ্যবেলঘরিয়ায় চতুষ্পাঠী খুলেন। এবার নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। নানা জনপদ হইতে শিষ্যমণ্ডলী আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাদিগের বিদ্যালাভস্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিল।

শিবচন্দ্রের বিত্ত বা বৈভব কিছুই ছিল না, তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দারা

ছাত্রবৃন্দের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী স্বহস্তে পাক করিয়া এই সমস্ত ছাত্রের অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এখনকার মত পূর্ব্বে পাচক বা পাচিকা রাখিবার প্রথা ছিল না। বাটীর স্ত্রীলোকেরাই পাকাদি সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিতেন।

শিবচন্দ্রের প্রণীত নানা সংস্কৃত গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহার মধ্যে ১৭ খানি মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য এবং ১৭ খানি দর্শনাদি। উহার মধ্যে কয়েক খানি গ্রন্থ দিগাপতিয়ার রাজা দয়ারামের নামে উৎসর্গীকৃত। যে সকল বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধি-কারী তাঁহার চতুষ্পাঠীর সাহায্য করিতেন, তিনি স্বীয় গ্রন্থে তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

শিবচন্দ্রের ধনলোভ একবারেই ছিল না। তিনি যখন যাহা পাইতেন, ছাত্রদেরই হস্তে সম-র্পণ করিতেন। তাহারাই তাঁহার বাটীর পরিদর্শক ছিল। সমস্ত উত্তর বঙ্গে শিবচন্দ্রের প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এক সময়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাধাকান্ত দেব মহোদয় কোনও একটি বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া,

বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর শরণাপন্ন হন। কিন্তু, কেহই তাঁহার প্রমাণটি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন না; কেবল শিবচন্দ্রই উহা সংগ্রহ করিয়া দিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মান রক্ষা করেন। এজন্য বিদ্যোৎসাহী রাজা রাধাকান্ত দেব মহোদয় মতাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন।

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত অতি অমায়িক, বিনীত, অহমিকাশূন্য ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন, বিশেষতঃ তিনি কখনও আপন বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষের গৌরব করিতেন না। তিনি কি ধনশালী, কি দরিদ্র, সকল লোকেরই প্রশংসাভূমি ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাদান ও গ্রন্থ রচনায় সময়াতিপাত করিয়াছেন। জনক জননীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি জনকজননীকে সাক্ষাৎ দেবদেবী জ্ঞান করিতেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী "চুপি" নামক এক সামান্য গ্রামে ১২২৭ সালে কায়স্থকুলে অক্ষয়-কুমার দত্তের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। তিনি সামান্য বেতনের কর্ম্ম করিয়া কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

অক্ষয়কুমার পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া কিছু পারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন। দশ বর্ষ বয়ঃ-ক্রমকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার মানসে খিদিরপুরে নিজের বাসায় আনয়ন করেন। কোনও ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করা-ইয়া যথারীতি লেখাপড়া শিখান, তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না। অক্ষয়কুমার প্রথমতঃ বাসার সন্নিহিত একজন সরকারের নিকট ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, এবং কিছুদিন পরে বিনা বেতনে এক মিসনরি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু তাঁহার পিতা ধর্ম্মলোপ আশঙ্কায় ঐ বিদ্যা-লয় হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনেন। সুতরাং ঐ সময়ে প্রকৃত পক্ষে অক্ষয়কুমারের লেখাপড়ার দ্বার রুদ্ধ হয়। তজ্জন্য তিনি অতিশয় দুঃখিত

হইয়াছিলেন। তিনি কোনও ভাল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া রীতিমত অধ্যয়ন করিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতার অসঙ্গতিপ্রযুক্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এজন্য তিনি সর্ব্বদাই দুঃখিত মনে ও ম্লান বদনে থাকিতেন। তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র অক্ষয়কুমারকে সর্ব্বক্ষণ বিমর্ষ দেখিয়া, তাঁহাকে কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ মাত্র। খিদিরপুর হইতে ঐ আঢ্যের বিদ্যালয় প্রায় পাঁচ মাইল। অক্ষয়কুমারকে প্রত্যহ এই পথ যাতায়াত করিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তৎকালে ঠিকা গাড়ী বা ট্রাম গাড়ী ছিল না; এবং থাকিলেও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা অক্ষয়কুমারের পক্ষে অসাধ্য ছিল।

তাঁহার পিতৃব্যপুত্র কলিকাতায় কোনও এক স্বসম্পর্কীয়ের বাসায় অক্ষয়কুমারের অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা করেন, এবং স্বয়ং ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। অক্ষয়কুমার ঐ স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া, অপ্রতিহত যত্ন ও অবিরত পরিশ্রম সহকারে আড়াই বর্ষ মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী ভাষায়

কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা পীড়া নিবন্ধন বিষয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাটীতে অবস্থিতি করেন; এবং কিছু-দিন পরে কাশী গিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

যদিও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র অক্ষয়কুমারের লেখাপড়া শিক্ষার সকল ব্যয়ভার বহন করিতে-ছিলেন; তথাপি অক্ষয়কুমারের গর্ভধারিণী সাংসা-রিক অর্থকষ্ট নিবারণার্থ পুত্রকে চাকরী করিবার জন্য আদেশ করেন।

তিনি জননীকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি-তেন। সেই হেতু তিনি গর্ভধারিণীর আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য, অগত্যা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তথাপি তিনি বিদ্যাশিক্ষায় ঔদাস্যা-বলম্বন করেন নাই। ঐ সময়ে তিনি কয়েকজন কৃতবিদ্য লোকের নিকট নিরতিশয় যত্ন ও অধ্য-বসায় সহকারে ইংরাজী সাহিত্য ও সমস্ত ক্ষেত্র-তত্ত্ব, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞানের অনুশীলনে সাতিশয় অনুরাগী ছিলেন।

অক্ষয়কুমার ধনোপার্জ্জনের জন্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার চাকরী জুটিয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় প্রভাকর নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

ঐ সময়ে অক্ষয়কুমার স্বদেশীয়গণের হিতকামনায় দেশীয় ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিবার মানস করেন। সংস্কৃত ভাষায় কিছু জ্ঞান থাকিলে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিতে সক্ষম হইবেন, এতদভিপ্রায়েই তিনি কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় পদ্য রচনা করিবার জন্য অনেকে অনুরাগী ছিলেন। তিনিও প্রথমে পদ্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি প্রভাকরসম্পাদকের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং গদ্যে নানা প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়া প্রভাকর সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। একদিবস প্রভাকর সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন না; এজন্য, সম্পাদক মহাশয় অক্ষয়কুমারকে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিতে বলেন। তিনি বলেন; আমি কখনও ইংরাজী

হইতে অনুবাদ করি নাই। অতএব আমি উহা অনুবাদ করিতে পারিব না। তচ্ছ্রবণে সম্পাদক বলিলেন, তুমি ভালরূপ অনুবাদ করিতে পারিবে, আমার এরূপ ধারণা আছে। অক্ষয়কুমার তাঁহার অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া অনুবাদ করেন। সম্পাদক উহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যিনি এখানে বহুদিন ঐ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তিনিও এরূপ সরল ও ওজস্বিনী ভাষায় লিখিতে সক্ষম নহেন। তোমার রচনায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে; এই রচনা দেখিয়া আমি পরম প্রীত হইয়াছি। সম্পাদকের প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুবাদ করিবার জন্য সমধিক উৎসাহ বৃদ্ধি হয়।

একদিন অক্ষয়কুমার ঐ সম্পাদকের সহিত ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে যান। তথায় বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

পরে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইলে, অক্ষয়কুমার মাসিক ৮৲ আট টাকা বেতনে ঐ পাঠশালার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিয়দ্দিবস পরে মাসিক দশ টাকা, তদনন্তর চৌদ্দ

টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। অক্ষয়কুমার বর্ণমালা, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ঐ সময়ে তিনি সভার সাহায্যে পাঠ-শালার জন্য একখানি ভূগোল মুদ্রিত করেন, পরে ঐ পাঠশালা কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়া নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ অক্ষয়কুমারকে তথায় মাসিক ত্রিংশৎ মুদ্রা বেতনে প্রধান অধ্যাপকের পদ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ঐ কর্ম্ম গ্রহণে অস-ম্মতি প্রকাশ করেন। কারণ, কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বলে যাইলে তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ একবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

কিছুদিন পরে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে এক-খানি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব হয়। কাহাকে ঐ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করা হইবে, এই বিষয়ে অনেক বাদানুবাদের পর স্থিরীকৃত হয় যে, প্রার্থি-গণের মধ্যে পরীক্ষায় যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তিনিই ঐ পদে নিযুক্ত হইবেন। পরী-ক্ষার্থীদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের রচনা সর্ব্বোৎকৃ[illegible] হওয়ায় তিনিই ঐ পদে নিযুক্ত হন।

তিনি প্রভূত পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত কার্য্য

নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ক্রমশঃ তাঁহার বেতন ত্রিংশন্মুদ্রা হইতে ষষ্টিতম মুদ্রা পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি দুই বৎসর কাল সময়ে সময়ে মেডিকেল কালেজে যাইয়া, আন্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে উদ্ভিদাদি বিজ্ঞান বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিয়া সম্যক পারদর্শিতা লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন নানা ইংরাজী গ্রন্থও স্বয়ং অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়েই তিনি ফরাসী ভাষা শিখিয়া জর্জকুম্তের প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করেন।

তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য যে সমস্ত প্রবন্ধাদি লিখিতেন, তাহা পত্রিকায় প্রকাশের পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখাইতেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া, পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে,"বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যার্থিগণ আপনার রচিত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া বাঙ্গালা রচনা করিতে সমর্থ হইবেক।" তিনি যাঁহা বলিয়াছিলেন, পরে এক সময়ে তাহাই ঘটিয়াছিল।

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রায় দ্বাদশ বর্ষ কাল প্রভূত

যত্ন ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সহকারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি যে উৎকৃষ্ট নূতন বাঙ্গালা গদ্য রচনার রীতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অগ্রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনার ওজস্বিতা ও লালিত্য সন্দর্শনে, পাঠকমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে, কৃতবিদ্য লোক মাত্রেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিতেন।

ঐ সময়ে, তিনি ঐ পত্রিকায় নানা বিষয়ে কত যে গবেষণাপূর্ণ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রচনা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি আপনার ও বাঙ্গালাভাষার এবং পত্রিকার উন্নতি সাধনার্থ দিবারাত্র কায়িক, বাচিক ও মানসিক কঠোর পরিশ্রম করিতেন; তাহাতেই তাঁহার জন্মের মত স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

অনেক দিন হইতে তিনি অজীর্ণ ও শিরঃপীড়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতিশয় মানসিক পরিশ্রম নিবন্ধন তাঁহার শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িল। এজন্য, তিনি রাত্রিতে

আর পূর্ব্বের মত অধ্যয়নাদি কোনও কার্য্যই করিতে পারিতেন না।

কিছুদিন পরে তিনি পীড়ার আতিশয্য নিবন্ধন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিতপ্রবন্ধ গুলি পুস্তকাকারে পুনর্ম্মুদ্রিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না; তজ্জন্য, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের অনুমতি লইয়া, ঐ সমস্ত প্রবন্ধ সংশোধন পূর্ব্বক পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এইরূপে, তৎপ্রণীত বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, ধর্ম্মনীতি, চারুপাঠ, পদার্থবিদ্যা, এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি বিবিধ উপদেশপূর্ণ কয়েক খানি পুস্তক প্রচারিত হয়।

এই সময়ে কলিকাতায় নর্ম্মালবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তকে বিদ্বান্, ধীশক্তিসম্পন্ন ও বাঙ্গালা ভাষার সুলেখক বলিয়া জ্ঞান থাকায়, ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আগ্রহ সহকারে, ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে অনুরোধ করিয়া, মাসিক দেড়

শত টাকা বেতনে তাঁহাকে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত কয়েক বৎসর নর্ম্মালবিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, পুনরায় এরূপ পীড়িত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অবকাশ গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতে হইত; এবং পরিণামে পীড়াধিক্য প্রযুক্ত তিনি স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বালী গ্রামে ভাগীরথীর তীরে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন। তিনি ঐ স্থানেই ১২৯৩ সালে ৬৬ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতি প্রযুক্ত, তাঁহাকে কোনও বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে সকল বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক যথেষ্ট বিদ্যোপার্জ্জন করেন। বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, অক্ষয়কুমার দত্ত বঙ্গভাষার একজন পরিমার্জ্জক।

তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়া অনেক গ্রন্থ-কার বঙ্গভাষায় বিবিধ প্রবন্ধাদি লিখিয়া জন-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে পরিবার প্রতিপালনের জন্য অপ্রমিত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ মানবগণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে লেখাপড়া শিক্ষা করিলে, ধন, মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।

কলিকাতার দক্ষিণ চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত মুরাদিপুর নামে এক সামান্য গ্রাম আছে। তথায় ১২১১ সালে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণবংশে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি এক জন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণব্যবসায়ী অধ্যাপক ছিলেন। তদীয় চতুষ্পাঠীতে বহুসংখ্যক বিদ্যার্থী ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত।

শৈশব কালেই জয়নারায়ণের মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতৃষ্বসা তাঁহাকে লালন পালন করেন। পূর্ব্বতন নিয়মানুসারে পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জয়নারায়ণ পাঠশালায় প্রেরিত হন। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি পিতৃসন্নিধানে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। অসাধারণ ধীশক্তি ও রীতিমত পরিশ্রমের বলে, তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের মধ্যেই ব্যাকরণ, অমরকোষ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে নব্য

ও প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রের অধিকাংশ অধ্যয়ন করিয়া, ভবানীপুরনিবাসী রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের নিকট অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ তৎকালীন অতি বিখ্যাত নৈয়ায়িক শালিখানিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট গমন করেন; এবং তাঁহার নিকট নিরন্তর প্রায় দশ বৎসর কাল সমধিক যত্ন সহকারে শিক্ষালাভ করিয়া ন্যায়দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্বে, একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, জয়নারায়ণ শালিখা হইতে কলিকাতায় যাইয়া তৎকালীন সংস্কৃতকালেজের অধ্যাপক গুর্জ্জরদেশীয় নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট অনেকগুলি বেদান্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, তাহাতে সমীচীন ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন।

জয়নারায়ণ যখন জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তৎকালে, তিনি অধ্যাপকের সহিত নানা দেশে অধ্যাপকসভায় নিমন্ত্রণে যাইতেন। সভায় সমাগত কোনও পণ্ডিত তাঁহার সহিত বিচারে জয়ী হইতে পারিতেন না। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই, জয়নারায়ণ

তর্কপঞ্চানন একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইলেন।

অনন্তর ষড়্‌বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তাঁহার অধ্যাপকের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, স্থানীয় লোকের সাতিশয় অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, তর্কপঞ্চানন শালিখায় চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই নানা দেশ হইতে ছাত্রমণ্ডলী সমাগত হইয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, সাঙ্খ্য ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে, তর্কপঞ্চাননের এরূপ সঙ্গতি ছিল না যে, ছাত্রগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করেন। তৎকালীন বিদেশীয় বিদ্যার্থিগণের ভোজনাদির ব্যয়ভার অধ্যাপকের উপরেই নির্ভর করিত। তর্কপঞ্চাননের পিতা কেবল তাঁহার নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত পাঁচটী করিয়া টাকা মাসে মাসে দিতেন। তর্কপঞ্চানন নিমন্ত্রণে যাহা কিছু বিদায় প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দ্বারা ছাত্রগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত না; সুতরাং, তিনি অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইয়া, সাতিশয় কষ্টকর অবস্থায় পড়িলেন; তথাপি তাঁহার উদ্যমভঙ্গ হয় নাই।

অনন্তর শালিখানিবাসী কতিপয় সদাশয় লোক তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

তর্কপঞ্চানন অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইয়া, প্রাতঃকাল হইতে বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিতেন; এবং পুনরায় সন্ধ্যার পর, ছাত্রদিগের পাঠের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত চতুষ্পাঠীতে অতিবাহিত করিতেন। তর্কপঞ্চানন যখন এইরূপে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন, তিনি "ল কমিটীর" পরীক্ষা দিয়া জজ-পণ্ডিত হইবার প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি অধ্যাপনা কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করেন নাই। ফলতঃ বিদ্যাদান কার্য্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

তৎকালে, সংস্কৃত কালেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে সমাগত পণ্ডিতগণ ন্যায়-শাস্ত্রের বিচারে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার

করিতেন। তাঁহার ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কূট প্রশ্ন-সমূহের উত্তর দিতে কেহই সমর্থ হইতেন না। পরে, এক দিবস, শিরোমণি মহাশয়ের সহিত তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের লিখিত বিচার হয়; তাহাতে শিরোমণি মহাশয় তাঁহার কূট প্রশ্নাদির সদুত্তর প্রাপ্তিতে পরম প্রীত হইয়া, তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহাকে কালেজে আহ্বান করেন; এবং তর্কপঞ্চানন কালেজে উপস্থিত হইলে সাধারণ সমীপে তাঁহার অলৌকিক বিদ্যাবত্তার ও অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া বলেন যে, বাঙ্গালা দেশে পণ্ডিত-গণের মধ্যে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননই আমার স্থান অধিকার করিবার যোগ্য।

অনন্তর অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ঐ পদ পাইবার জন্য অনেকেই আবেদন করেন। কিন্তু পরীক্ষায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এজন্য, জয়নারায়ণ ১৮৪০ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে মাসিক অশীতি মুদ্রা বেতনে সংস্কৃত কালেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

তর্কপঞ্চানন মহাশয় ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষ-

তার সহিত অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি কালেজের কর্ম্ম স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনার প্রবৃত্তি গেল না। তিনি কলিকাতার অন্তর্গত বাহির সিমুলিয়ায় সংস্থাপিত চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় বিদ্যার্থিগণকে প্রাতে ও রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ বিদ্যাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া, তর্কপঞ্চানন সিমুলিয়ার চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নারিকেলডাঙ্গা নামক স্থানে, অপেক্ষাকৃত এক প্রশস্ত বাটী ক্রয় করিয়া, তথায় অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কালেজের ছাত্রগণের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এবং চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ, হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন ও তারাচাঁদ তর্করত্ন প্রভৃতি মহাশয়গণ সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়াছেন।

জয়নারায়ণ সর্ব্বদা অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, এজন্য অধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যাইতে

পারেন নাই। তাঁহার অধিক অর্থোপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি ছিল না; তথাপি বিদ্যার্থিগণের পাঠসৌকর্য্যার্থে, তিনি কণাদসূত্রবিবৃতি নামক একখানি বৈশেষিক দর্শনের টীকা ও পদার্থতত্ত্বসার নামক ন্যায়গ্রন্থ প্রচারিত করেন। তিনি একজন সুকবি ছিলেন, ঈশ্বরের উপাসনার উদ্দেশে সংস্কৃত পদ্যে তারকেশ্বর স্তব ও চামুণ্ডাশতক, ভৈরবপঞ্চাশিকা প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তিনি পঞ্চদশ দর্শন ও শাঙ্করদর্শনের স্থূল মর্ম্ম বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত করিয়া সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক পুস্তক প্রচারিত করেন। এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তর্কপঞ্চানন স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। অধুনাতন সকল লোকেই এমন কি সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত উক্ত দর্শন গ্রন্থ সমূহের মত হৃদয়ঙ্গম করিতে সহজেই সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য সকলেই তর্কপঞ্চাননের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে তিনি ১২০ টাকা বেতনের পদ পরিত্যাগ করিয়া পেন্‌সন্‌ গ্রহণ পূর্ব্বক বারা-

ণসী যাত্রা করেন। তথায় যাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত-ভাবে কালযাপন করেন নাই; প্রতিদিন প্রাতঃ-কাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্রের অধ্যা-পনায় কালাতিপাত করিতেন। তিনি প্রাতঃ-কালে সমাগত বিদ্যার্থিগণকে ষড়্‌দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন। অপরাহ্নে দণ্ডী, পরমহংস ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সংসারবিরত মহাত্মাগণ যোগ-শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিদ্যার্থীকে সবিশেষ সমা-দর করিয়া শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষাদান-নৈপুণ্যে, সবিনয় বাক্যে ও নম্রতায় সকলেই অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইতেন।

কাশীর রাজা তর্কপঞ্চাননকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মাসহারার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

তর্কপঞ্চাননের কাশীবাসকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয় তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি প্রিয়শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া-ছিলেন যে, আজ দ্রোণের আবাসে অর্জ্জুন আসিয়াছেন।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন অতিশয় অমায়িক, বিনয়ী ও অসামান্যগুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যাদান ও অন্নদান করিয়া সময় যাপন করিয়াছেন। অতি সামান্য লোককেও তিনি সমাদর করিতে ত্রুটি করিতেন না। কেহ কখনও তাঁহাকে কাহারও প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখে নাই। তিনি স্বতঃ পরতঃ যথাসাধ্য লোকের উপকার করিতেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন মার্শেল্ সাহেব ও শ্রীযুক্ত কাউএল্ সাহেব মহোদয় তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। এজন্য তর্কপঞ্চানন উল্লিখিত সাহেবদিগকে অনুরোধ করিয়া অনেকের ভাল ভাল কর্ম্ম করিয়া দিয়াছেন।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একোন সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কাশীলাভ করেন।

প্যারীচরণ সরকার।

১৮২৩ খৃঃ অব্দের ২৩ শে জানুয়ারি কলিকাতায় প্যারীচরণ সরকারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র সরকার। প্যারীচরণ তাঁহার জনকজননীর তৃতীয় সন্তান ছিলেন। তিনি পঞ্চম-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হেয়ার সাহেবের বাঙ্গালা পাঠ-শালায় অধ্যয়নার্থ প্রবিষ্ট হন। তথায় তিনি প্রতি বৎসর পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতেন, এজন্য, হেয়ার সাহেব ঐ বিদ্যালয়ের অন্যান্য সকল ছাত্র অপেক্ষা তাঁহাকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন। কিছুদিন পরে তিনি ইংরাজী শিক্ষার্থ হেয়ার সাহেবের ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ঐ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর, তিনি বিনা বেতনে হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হইয়া যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

প্যারীচরণ প্রতি বৎসরেই পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান, সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক, সর্ব্বপ্রধান মাসিক বৃত্তি ও সুবর্ণপদক লাভ করিতেন। তৎকালে, ঐ কালেজে আর কোনও ছাত্র তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কালেজের পাঠ সমাপনের কয়েক মাস পূর্ব্বে,

হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের হেড মাষ্টার তাঁহার অগ্রজ সহসা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। সুতরাং সংসারের ভার তাঁহা-রই উপরে পতিত হইল। এজন্য প্যারীচরণ অগ্রজের পদপ্রাপ্তির অভিলাষে তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে ঐ পদ প্রদান না করিয়া, তন্নিম্নস্থ এক শিক্ষকের পদে মাসিক অশীতি মুদ্রা বেতনে নিযুক্ত করেন।

তিনি হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রায় দুই বর্ষ কাল দক্ষতার সহিত শিক্ষকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; এই হেতু কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে দেড় শত টাকা বেতনে বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। বারাসতবাসী জনগণ তাঁহার অধ্যাপনা কার্য্যে ও সৌজন্যাদি গুণ সমূহে পরম প্রীত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি, চারি বৎসরের মধ্যে বালক-গণকে ইংরাজী শিখাইয়া জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইব, এরূপ মানস করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তিনি সুকুমারমতি বালকগণের পাঠসৌক-র্য্যার্থে ফার্ষ্ট্ বুক অব্ রিডিং হইতে সিক্স্থ্ বুক্ অব্

রিডিং ও কয়েক ভাগ জিওগ্রাফি (ভূগোল) প্রভৃতি পুস্তক প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তক সকল বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যালয় সমূহে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তিনি ঐ সকল পুস্তক রচনায়, আপন বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এবং এতদ্দেশে বিশেষ প্রশংসাভাজন ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

প্যারীচরণ উদ্ভিদবিদ্যাতেও সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বারাসতের বিদ্যালয়ের বহির্ভাগে একটি আদর্শ উদ্যান প্রস্তুত করাইয়া, স্বহস্তে মৃত্তিকা খননাদি কার্য্য করত স্বীয় ছাত্রদিগকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বারাসত স্কুলে ছাত্রাবাস স্থাপিত করেন। তৎকালে কলিকাতায় দেশীয় ছাত্রাবাসের নামও কেহ অবগত ছিলেন না।

তিনি কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে দেশীয় অবলাগণের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণ মানসে বারাসতে সর্ব্বপ্রথমে একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইহাতে ঐ স্থানের কতিপয় সম্ভ্রান্ত

লোক তাঁহার পরম শত্রু হইয়াছিলেন; এবং এতদুপলক্ষে বারাসতনিবাসী জনগণের মধ্যে অতিশয় দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ও তাঁহার পক্ষাবলম্বী বন্ধুগণ বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া কিছুদিনের জন্য সমাজচ্যুত হইয়াও কিছুমাত্র শঙ্কিত বা বিচলিত হন নাই। তাঁহারা অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে, অনুক্ষণ ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই প্যারীচরণ স্বীয় ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও সৌজন্যাদি গুণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিবিধ হিতগর্ভ উপদেশ বাক্য দ্বারা স্থানীয় বিপক্ষপক্ষকে বশীভূত করেন।

এই সময়ে দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, তদানীন্তন বিদ্যালয় সমূহের অধ্যক্ষ মহামতি বেথুন সাহেব মহোদয় বারাসতের বালিকাবিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের জন্য ও স্থানীয় লোক সমূহকে উপদেশ দিয়া উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ মধ্যে মধ্যে স্বয়ং তথায় যাইতেন।

প্যারীচরণ বারাসতে অবস্থান কালে অনেক দরিদ্র বালককে অর্থসাহায্য করিয়া ইংরাজী লেখাপড়া শিখাইতেন। এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে অনে-

কেই কৃতবিদ্য, সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তথায় অনেক নিরুপায় লোককে অর্থ সাহায্য করিতেন।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে প্যারীচরণ বারাসত পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ের নানাবিধ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; এবং শিক্ষকগণের সামান্য বেতন অবলোকন করিয়া তৎকালীন এডুকেশন্ কৌন্সিলে রিপোর্ট করিয়া শিক্ষকগণের বেতন-বৃদ্ধি করান, কিন্তু নিজের বেতনবৃদ্ধির জন্য কোনও কথাই লিখেন নাই। হেয়ার স্কুলে তাঁহার অবস্থান কালে স্কুলের বিশেষ উন্নতিসাধন হইয়াছিল। হেয়ার স্কুলের অধ্যাপনার সুশৃঙ্খলায় প্রীত হইয়া, ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকগণ আপন আপন বালকদিগকে অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া, এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে লাগিলেন।

তিনি এই বিদ্যালয়ে দশ বর্ষ কাল দক্ষতার সহিত শিক্ষকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাধারণের নিকট সাতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে তাঁহার মাসিক বেতন ৩০০৲ টাকা ছিল।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সি কালেজে ৭৫০৲ টাকা বেতনে সহকারী ইংরাজী সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তথায় তিনি চারি বর্ষ কাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং স্বীয় বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বহুদর্শিতার বিশিষ্টরূপ পরিচয় দেন। ছাত্র সমূহ তাঁহার সৌজন্যাদি গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইত এবং তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

তিনি যে, কেবল ইংরাজী বিদ্যার অনুশীলন করিয়াই সময়াতিপাত করিতেন, এরূপ নহে। দেশীয় ভাষাতেও তাঁহার সম্যক্ পারদর্শিতা ছিল। তিনি দক্ষতার সহিত কতিপয় বর্ষ "এডুকেশন্ গেজেট" নামক বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা কার্য্য সম্পাদন করিয়া অশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এডুকেশন্ গেজেটের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৩০০৲ টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। এই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ লইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার মতভেদ হওয়ায়, তিনি স্বীয় সত্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতার যথার্থ পরিচয় দিয়া ঐ

সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা কার্য্য ও স্বত্ব অম্লান বদনে পরিত্যাগ করেন।

তদনন্তর তিনি "সুরানিবারণী" নামে এক সভা সংস্থাপন করেন, এবং ইংরাজী ভাষায় "ওয়েল্ উইসার" ও দেশীয় ভাষায় "হিতসাধক" নাম দিয়া তৎসংক্রান্ত দুই খানি মাসিক পত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া মদ্যপান নিবারণে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। সমাজের উন্নতিসাধন ও পরোপকার করা, তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারই প্রযত্নে ও তাঁহারই অর্থব্যয়ে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথমে "হিন্দুহোষ্টেল্" অর্থাৎ ছাত্রাবাস সংস্থাপিত হয়।

সন ১২৭২ সালে সমস্ত বঙ্গদেশে ও উড়িন্যায় অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত ধান্যাদি শস্য ভালরূপ জন্মে নাই সুতরাং ১২৭৩ সালে তণ্ডুলাদি শস্য অত্যন্ত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। মফঃস্বলবাসী দরিদ্রলোক সমূহ অন্নাভাবে দেশ পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতার গলিতে গলিতে অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া ভ্রমণ করিত; তদ্দর্শনে প্যারীচরণ দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করত চাঁদা সংগ্রহ করিয়া চোরবাগানে এক অন্নচ্ছত্র সংস্থাপিত করেন। ঐ সময়ে তিনি

প্রতিদিন বিদ্যালয়ের শেষ দুই ঘণ্টা অবসর গ্রহণ করিয়া বাটীতে আগমন পূর্ব্বক অন্নচ্ছত্রস্থিত দরিদ্রগণকে স্বহস্তে পরিবেশন করিতেন।

তাঁহার হৃদয় কারুণ্যরসে পূর্ণ ছিল। তিনি প্রত্যহ অনেক দীনদরিদ্র, অনাথ ও নিরুপায় বিধবাদিগকে গোপন ভাবে যথেষ্ট অর্থ দান করিতেন; এজন্য তিনি বিশিষ্টরূপ ধন সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রণীত পুস্তকবিক্রয় দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন হইত; এবং তাঁহার বেতনও ৭৫০৲ টাকা ছিল। অন্য কোন ধনাভিলাষী লোকের এরূপ উপার্জ্জন থাকিলে, সে ব্যক্তি একজন বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী লোক হইতে পারিত, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি চোরবাগানে একটি প্রিপ্যারেটর্ স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং বহু বর্ষ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

তিনি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে চোরবাগানে একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ বিদ্যালয়টি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি জননীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। জননী যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তদ্বিষয়ে প্যারীচরণ সতত যত্নবান ছিলেন। জননীর অসম্মতিতে তিনি কখনও

কোনও কার্য্য করেন নাই। প্যারীচরণ স্বতঃ পরতঃ উপরোধ করিয়া অনেক দরিদ্রের অন্ন-সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মশীল ও সত্যপরায়ণ ছিলেন।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে প্যারীচরণ পীড়িত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে, অনেকগুলি দরিদ্র বালক তাঁহার ভবনে আসিয়া বলিতে লাগিল যে, এই মহাত্মা আমাদের স্কুলের বেতন প্রদান করিতেন। ইহার পূর্ব্বে প্যারীচরণের বাটীর অপর কেহ এই সংবাদ অবগত ছিলেন না; তাঁহার বাক্স মধ্যে এক খানি খাতা ছিল, তাহাতে দৃষ্ট হইল যে, তিনি ঐ সকল বালকদিগের স্কুলের বেতন এবং কাণ, খঞ্জ ও দরিদ্র বিধবাদিগকে সাহায্য স্বরূপ মাসে মাসে ১২১৲ টাকা দান করিতেন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর্ মহানুভব দেশ-হিতৈষী বিদ্যোৎসাহী, প্যারীচরণ সরকার লোকান্তর গমন করেন।

রাম শাস্ত্রী।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাধীন অবস্থায় তাঁহাদের দেশে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাম শাস্ত্রীর নাম ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা, ন্যায়পরায়ণ, পরিশ্রমশীল ব্যক্তি জগতে অতি বিরল। মহারাষ্ট্র দেশীয় লোকেরা অদ্যাপি রাম শাস্ত্রীর নাম শ্রবণ করিলে ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

বিগত শতাব্দীর প্রথমাংশে সেতারার সন্নিহিত মাহোলী নামক গ্রামে এক দরিদ্র পণ্ডিতের গৃহে রাম শাস্ত্রীর জন্ম হয়। তিনি অতি অল্প বয়সেই শাস্ত্রাধ্যয়নার্থ বারাণসী যাত্রা করেন, তথায় পাঠাবস্থাতেই তাঁহার এতই প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, পাঠসমাপনান্তে স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইবামাত্রই বালজী বাজীরাও পেশোয়া তাঁহাকে পণ্ডিত রাওএর পদে নিযুক্ত করিলেন। সমস্ত বিচার বিভাগ ও হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত সমস্ত রাজকার্য্যের ভার, পণ্ডিত রাওএর উপর অর্পিত থাকিত।

মহারাষ্ট্র দেশে এই পদ প্রাপ্তির জন্য সময়ে

সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কৃতবিদ্য, প্রজ্ঞাবান রাম শাস্ত্রী বিনা চেষ্টায় ও বিনা আয়াসে এই গুরুতর কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন, এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে পদোচিত কার্য্য সমূহ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

তৎকালে মহারাষ্ট্রদেশে সমস্ত দেওয়ানী মকদ্দমার ভার পঞ্চায়ৎগণের হস্তে অর্পিত ছিল, কিন্তু পঞ্চায়তেরা অনেকেই উৎকোচ গ্রহণ করিতেন এবং সকলেই বিচার কার্য্যে অমনোযোগী হইতেন। রাম শাস্ত্রী বিচার বিভাগের সমস্ত ভার প্রাপ্ত হইয়াই এরূপ পরিশ্রম সহকারে ও তীব্রদৃষ্টিতে পঞ্চায়ৎগণের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন যে, পঞ্চায়ৎমণ্ডলী সম্পূর্ণরূপে নূতন রূপ ধারণ করিল। উৎকোচ গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়িল। বিচার কার্য্য যথাসময়ে ও যথাবিধি নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন, মহারাষ্ট্র দেশে এরূপ সুন্দর বিচারপ্রণালী পূর্ব্বে কখনও ছিল না, এবং পরেও কখনও হয় নাই।

বালজী বাজীরাওএর পুত্র মধুরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে সমস্ত রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। রামশাস্ত্রীর

প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এক সময়ে মধু-রাও রাজকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক জপতপে অত্যন্ত মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, রাম শাস্ত্রী একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি ব্রাহ্মণ, যদি তপজপাদিতে মনোনিবেশ করাই আপনার অভিপ্রেত হয়, চলুন, আমরা উভয়েই কাশীবাস করি। রাজ-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া কেবল তপজপাদিতে সময় ক্ষেপণ করিলে প্রজার সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। মধুরাও এই তীব্রোক্তিতে পরম প্রীত হইয়া অধিকতর পরিশ্রমের সহিত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

১৭৭২ খৃঃ অব্দে মধুরাওএর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। তখন নারায়ণ রাওএর বয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত রাজ্যপ্রাপ্তির অচির কাল পরেই হঠাৎ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহার প্রাণবিনাশ হয়। এই ঘটনাতে তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হন, এবং বিপুল সেনা

সংগ্রহ করিয়া মহীসুরাধিপতি হায়দার আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করেন।

সমস্ত উদ্যোগ সম্পন্ন হইলে, রাম শাস্ত্রী এক-দিন রঘুনাথ রাওএর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। অতএব আপনি সমুচিত দণ্ড গ্রহণ না করিয়া রাজধানী ত্যাগ করিতে পারিবেন না। বাস্তবিকও রাম শাস্ত্রী যাহা প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। রঘুনাথ রাও রাম শাস্ত্রীকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করি-লেন। কিন্তু রাম শাস্ত্রী গম্ভীরভাবে বলিলেন, দেখ রঘুনাথ! তুমি নরঘাতক, রাজপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তুমি রাজা হইয়া যখন বিচার গ্রহণ করিলে না, তখন এ রাজ্যে বিচারকার্য্যের ভার আর আমি লইব না; এবং তোমার পাপ রাজধানীতেও আর আসিব না। এই কথা বলিয়া তিনি রঘুনাথ রাওএর সন্নিধান পরিত্যাগ করত পুনা হইতে অনেক দূরবর্ত্তী ওয়ারীর সন্নিহিত এক নিভৃত পল্লীগ্রামে যাইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিলেন।

এরূপ তেজস্বিতা ও এরূপ সাহস জগতে অতি বিরল। কে সাহস করিয়া অশীতিসহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের নেতা রঘুনাথ রাওএর ন্যায় বীরপুরুষকে মুখের উপর নরঘাতক বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে? কেই বা মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের বিচারপতিত্ব পদ তৃণতুল্য উপেক্ষা করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনাতিপাত করিতে পারে?

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে ১৮২৪ খৃঃ অব্দে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পিতার তিন বিবাহ, তন্মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী রুক্মিণী দেবী হরিশের গর্ভ-ধারিণী ছিলেন।

ছয় মাস বয়ঃক্রমকালে হরিশ্চন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার জননী চিরদুঃখিনী ছিলেন। তাঁহার ভাগ্যে কখনও পতিগৃহে বাস করা ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি আজীবন ভবানীপুরে মাতুলালয়ে অব-স্থিতি করিয়া বহু কষ্টে কালযাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং হরিশও শৈশবকালে এই স্থানে প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন।

তিনি পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার অগ্রজের নিকট ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়নার্থ ভবানীপুরস্থ এক ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহার দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে

বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া লয়েন, এবং এই বিদ্যালয়েই প্রায় সাত বৎসর কাল যত্ন ও প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া তিনি ইংরাজী ভাষায় একপ্রকার ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

তাঁহার লেখাপড়া বিষয়ে আন্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলেও পারিবারিক দুরবস্থা প্রযুক্ত অধিক কাল বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি পরিবারগণের দুঃখ দূরীকরণ মানসে বিদ্যা-লয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য যত্ন-বান হন। কিন্তু সহসা তাঁহার কোন কর্ম্ম জুটিয়া উঠে নাই ; এজন্য তিনি আদালতের মোক্তারগণের দলীল ও আবেদন পত্র ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহাতে যাহা উপার্জ্জন হইত, তাহাতেই তিনি অতি কষ্টে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও দিন অনুবাদের কার্য্য উপস্থিত না হইলে, তাঁহাকে তৈজসাদি বন্ধক দিয়া দিনপাতের ব্যবস্থা করিতে হইত।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে তিনি টলা কোম্পানির আফিসে মাসিক আট টাকা বেতনে বিল লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কিয়দ্দিবস

পরে ঐ আফিসের প্রধান কর্ম্মচারীরা অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহার আরও দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সামান্য বেতনে বহু পরিবারের ভরণপোষণ দুষ্কর হইত, এবং এই স্থানে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাও নাই দেখিয়া তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করেন।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে সেনাসম্বন্ধীয় অডিটার আফিসে মাসিক পঞ্চবিংশতি মুদ্রা বেতনের এক পদ শূন্য হয়। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঐ পদপ্রার্থীদের পরীক্ষা-গ্রহণের আদেশ করেন। হরিশ্চন্দ্রও অন্যান্য প্রার্থীদিগের সহিত পরীক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এবং পরীক্ষা প্রদান করিয়া সর্ব্বপ্রধান স্থান অধি-কার করেন; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সন্তুষ্ট হইয়া ঐ পদে হরিশ্চন্দ্রকেই নিযুক্ত করেন।

তৎকালে ঐ আফিসের সর্ব্বাধ্যক্ষ সাহেবেরা হরিশের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন, এবং ক্রমশঃ মাসিক ৪০০৲ চারি শত টাকা বেতনে সহকারী মিলিটারী অডিটারেব পদে উন্নীত করিয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ আফিসে ১০০৲ এক শত টাকা বেতনের পদ শূন্য হইলে, কর্ম্মাধ্যক্ষ

সাহেবেরা প্রায়ই ইংরাজ বা ফিরিঙ্গিদিগকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু ঐ সময়ে ঐ সাহেবেরাই হরিশের কার্য্যদক্ষতায় এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে ঐ উচ্চ পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

হরিশ অত্যন্ত দরিদ্রের সন্তান। তিনি অতুল সম্মানের পদ প্রাপ্ত হইয়াও কখনও আপন পদের গৌরব করিতেন না, এবং অধীনস্থ সামান্য বেতনের কেরাণীদিগের সহিত বন্ধুভাবে কার্য্য সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি অত্যন্ত অমায়িক, সচ্চরিত্র ও সর্ব্বথা অহমিকাশূন্য ছিলেন। এজন্য সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

যদিও হরিশ অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার মর্য্যাদার মূল্য বুঝিতেন। এক সময়ে ঐ আফিসের উচ্চপদস্থ এক সাহেব তাঁহাকে সামান্য অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করাতে, তিনি তৎক্ষণাৎ চারি শত টাকা বেতনের সেই উচ্চপদও অতি তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, পদত্যাগের আবেদন পত্র অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। সাহেব তাহা পাইয়া হরিশকে

সান্ত্বনা করেন, এবং অতি নির্ব্বন্ধসহকারে ঐ পদ-ত্যাগপত্র প্রত্যাহৃত করিতে বলেন। তদবধি ঐ আফিসের সাহেবেরা তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও সমাদর করিতেন।

হরিশের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সুজনতার পরিচয় পাইয়া, অনেক দরিদ্র লোক সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আবেদন ও অভিযোগের কাগজাদি ইংরাজীতে অনুবাদ করাইয়া লইতে আসিত। তিনিও আগ্রহ-সহকারে ঐ সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দিতেন। এইজন্য হরিশ্চন্দ্রকে তৎকালপ্রচলিত আইন ও অন্যান্য নিয়মাবলী সম্যক্‌রূপে অধিগত করিতে হইয়াছিল। ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা দেখিয়া, তৎকালের সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে ওকালতী করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু, আফিসে কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট অবসর থাকে, এবং ঐ সময়ে লেখাপড়ার অনুশীলন করিয়া আত্মোন্নতি ও পরোপকার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়; ওকালতী করিলে ঐরূপ হইয়া উঠিবে না, এই আশঙ্কায় তিনি উহা হইতে নিবৃত্ত হন।

হরিশ কয়েক বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া

চাকরীর জন্য স্কুল পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি বিশিষ্ট সম্মানের পদ প্রাপ্ত হইয়াও কখনও আলস্যে কালহরণ করেন নাই। তিনি প্রতিদিন আফিসে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া, অপরাহ্ণে মেট্-কাফহলনামক সাধারণ পুস্তকালয়ে যাইয়া অভি-নিবেশ পূর্ব্বক, বহুবিধ ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতেন। পরে, বেতনবৃদ্ধি হইলে, তিনি অধ্যয়নার্থ স্বয়ং যথেষ্ট পুস্তক ক্রয় করেন; তদ্ভিন্ন আফিসের উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবেরাও তাঁহার অধ্যয়নে নিরতিশয় অনুরাগ দেখিয়া, পাঠার্থ প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক তাঁহাকে প্রদান করিতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। তিনি যে পুস্তক একবার অধ্যয়ন করিতেন, তাহা তাঁহার আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ থাকিত। ইহা দেখিয়া ও শ্রবণ করিয়া, তৎকালের কৃতবিদ্য অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

ঐ সময়ের অতি বিখ্যাত বাগ্মী ডাক্তার ডফ্ সাহেব মহোদয়, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে, বর্ত্তমান জেনেরল্ এসেম্ব্লিজ্ ইন্স্টিটিউসন্ নামক বিদ্যালয়ে বিবিধ মনোহর বক্তৃতা করিতেন। হরিশ্চন্দ্র আফি-সের অবকাশের পর প্রায়ই তথায় যাইয়া ঐ সকল

বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন; এবং তথা হইতে পদ-ব্রজেই প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী ভবানীপুর অক্লেশে যাইতেন।

তিনি পাঠাবস্থা হইতে নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়া ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ইংরাজীতে রচনা করিবার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। সুতরাং ক্রমশঃ তাঁহার রচনা বিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মে।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে মধুসূদন রায় কলিকাতা বড়-বাজারে সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুপেট্রিয়ট্ নামক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। হরিশ ঐ সংবাদপত্রের সমস্ত কার্য্যভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া রীতিমত সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

তৎকালে যে পরিমাণে গ্রাহকসংখ্যা ছিল, তদ্দারা ঐ সংবাদপত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না, সুতরাং মধুসূদন রায় ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদন ব্যাপারে ক্রমশঃ বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগি-লেন। এজন্য তিনি, ঐ সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ক্রেতা সহসা উপস্থিত না হওয়ায়, হরিশ অতি কষ্টে টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট ঐ

সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া ভবানীপুরে লইয়া যান। অতঃপর প্রতি সপ্তাহে উহা ভবানীপুরেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল।

তৎকালে অনেকেরই এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, রাজনীতি বিষয়ে কি দেশীয়, কি বিদেশীয় কেহই হরিশচন্দ্রের সমকক্ষ নাই। তিনি ইংরাজের অধীনে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিয়া রাজনীতি সমালোচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তৎকালীন রাজপুরুষেরাও দেশীয় লোকের প্রমুখাৎ দেশীয় লোকের অবস্থা অবগত হইবার জন্য সাতিশয় উৎসুক থাকিতেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে নানা প্রকার উৎসাহ প্রদান করিতেন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহ কালে ভারতবর্ষে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল। তৎকালে রাজপুরুষদের এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, দেশীয় লোকেরা বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত যোগ দিয়াছে। তৎকালীন ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে অশেষবিধ দোষারোপ করিয়া, তাঁহাদের সংবাদপত্র পূরণ করিতেন। ইহা পাঠ করিয়া রাজপুরুষেরা দেশীয় লোকের প্রতি সর্ব্বদা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ

করিতেন। অধিক কি, দেশীয় লোকের প্রতি সাহেবদিগের যথেষ্ট অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ঐ সময়ে ঐ সকল সংবাদপত্রের প্রতিবাদ করে, এরূপ অন্য কেহ ছিল না। তৎকালে কেবল হরিশ্চন্দ্রই দেশীয় লোকের হিতকামনায় বদ্ধপরিকর হইয়া, ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের ঐ সকল আরোপিত অমঙ্গলজনক প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করেন। দেশীয় লোকেরা ইংরাজরাজপুরুষদিগকে যে আন্তরিক ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকেন, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে হিন্দুপেট্রিয়টে প্রতিপন্ন করেন।

ঐ সময়ের অতি গুণগ্রাহী প্রজাবৎসল বড় লাট ক্যানিং সাহেব বাহাদুর ও ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সার সিসিল বীডন সাহেব মহোদয় হিন্দুপেট্রিয়টের প্রবন্ধগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া, হরিশ্চন্দ্রের প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দেশীয় লোকেরা যে ইংরাজরাজকে আন্তরিক ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকে, তাহাও তাঁহারা হিন্দুপেট্রিয়ট পাঠে বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়াছিলেন। ইংরাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য সংবাদপত্র সত্ত্বেও লর্ড ক্যানিং

বাহাদুর হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদপত্র পাঠে এতই আনন্দ অনুভব করিতেন যে, কোনও দিন দৈবক্রমে তাঁহার নিকট ঐসংবাদপত্র আসিতে বিলম্ব হইলে, তিনি হরিশ্চন্দ্রের বাটীতে স্বীয় পদাতিক প্রেরণ করিয়া উহা আনাইয়া লইতেন। ভারতবাসী কর্ত্তৃক প্রচারিত কোনও সংবাদপত্রের এরূপ সমাদর এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

এক সময়ে কোনও বিশেষ কার্য্যসাধনোদ্দেশে ভারতবাসীদের প্রতিনিধি স্বরূপ করিয়া, হরিশকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব হয়, হরিশ্চন্দ্রও এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। কিন্তু এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহার স্নেহময়ী জননীর নয়নদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুবারি বিনির্গত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে হরিশ ইংলণ্ড যাত্রা প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন।

তিনি ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার একজন প্রধান সদস্য ছিলেন; তজ্জন্য প্রতিদিন স্বীয় আফিসের কার্য্য সমাধান্তে উক্ত সভার কার্য্যালয়ে যাইয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ সভা হইতে দেশীয় লোকের হিতার্থে, মধ্যে মধ্যে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বা ভারতগবর্ণমেণ্টের সমীপে, যে আবেদনাদি প্রেরিত হইত, তাহা তিনিই

লিখিতেন। এতদর্থে তাঁহাকে আইন ও নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতে হইয়াছিল। এই সভার অন্যান্য কৃতবিদ্য সভ্যেরা তাঁহার সুচারুরূপ কার্য্য সম্পাদনে অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

যখন নীলকর সাহেবদের সহিত নীলবপনোপলক্ষে,যশোহর, রাজসাহী,নদীয়া,পাবনা, বারাসত প্রভৃতি কয়েক জেলার অসংখ্য দরিদ্র প্রজাবর্গের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন হরিশ ঐ দরিদ্র, বিপদাপন্ন প্রজাপুঞ্জের দুঃখমোচন মানসে তাঁহার হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদপত্রে প্রজাদের দুঃখসূচক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে নীলকর সাহেবেরা তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া, অসঙ্কুচিত চিত্তে অধিক যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন।

হরিশ্চন্দ্র যে কেবল সংবাদপত্রে প্রজাদের দুঃখবৃত্তান্ত লিখিয়াই নিবৃত্ত থাকিতেন, এরূপ নহে। তিনি তাহাদের দুঃখ দূরীকরণার্থ স্বয়ং অবিরাম পরিশ্রম করিয়া, বিপন্ন দরিদ্র প্রজাবর্গের

আবেদনপত্র লিখিয়া দিতেন; এবং ঐ সকল জেলার ধর্ম্মাধিকরণে ব্যবহারাজীবীদের দ্বারা প্রজাদের অভিযোগের সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

ইহা করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। পরিশেষে, যখন নীলকরনিপীড়িত সহস্র সহস্র প্রজা কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকট দুঃখ জানাইতে আসিয়াছিল, তখন ঐ সকল প্রজা ভবানীপুরে হরিশ্চন্দ্রের বাটীতেই যাইত। তিনি নিরুপায় নিরাশ্রয় সমাগত প্রজাদিগকে ভোজন করাইতেন, এবং অবস্থিতি করিবার জন্য স্থানও দিতেন। হরিশ ধনশালী লোক ছিলেন না; তথাপি প্রতিদিন সমুপস্থিত ক্ষুধার্ত্ত ঐ সকল প্রজাকে ভোজন করাইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতেও হইয়াছিল। ঐ সময় হরিশ্চন্দ্রই নিরাশ্রয় নীলকরনিপীড়িত প্রজাপুঞ্জের একমাত্র আশ্রয়স্থান হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; তজ্জন্যই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। হরিশের মত এরূপ নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারব্রতাবলম্বন অতি অল্পলোকেই করিয়া থাকেন।

তিনি মাসিক যে চারিশত টাকা বেতন পাই-তেন ও পেট্রিয়ট সংবাদপত্র হইতে যে লাভ পাইতেন, তাহা নিজের বা স্বসম্পর্কীয়ের সুখ সচ্ছন্দতার নিমিত্ত অতি অল্প মাত্র ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত টাকা নীলকরপ্রপীড়িত সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদিগের উপকারার্থে অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পরিবার প্রতি-পালনের জন্য এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

নীলকরদের বিরুদ্ধে অনেক কথা তাঁহার সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি ফৌজ-দারি আদালতে অভিযুক্ত হন। এই মকদ্দমার ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এই মকদ্দমার মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে অষ্টাধিক ত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমে হরিশ্চন্দ্র কালগ্রাসে নিপতিত হন।

আন্তরিক যত্ন ও অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অতিশয় হীন অবস্থার লোকেও যে ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি লাভ করিতে পারে হরিশ্চন্দ্র তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল।

জগন্মোহন বসু।

১৮০১ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী পিঙ্গলা নামক গ্রামে কায়স্থকুলে জগন্মোহন বসুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মধুসূদন বসু ধনশালি লোকের সন্তান ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার শেষাবস্থায় কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না। অবশিষ্ট যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তদ্দারা তাঁহার সাত পুত্র, তিন কন্যা ও অপরাপর পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। এই সময়ে উপযুক্তরূপ অন্ন বস্ত্রের অভাবে মধুসূদনের সন্তানগণ রুগ্ন হইয়া পড়ে; এবং পথ্য ও চিকিৎসাভাবে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা অকালে কালকবলে নিপতিত হয়; কিন্তু দৈবে চ্ছায় জগন্মোহন বাল্যাবস্থায় অশন বসনের যৎ-পরোনাস্তি ক্লেশানুভব করিয়াও দৃঢ় ও সবলকায় ছিলেন।

তিনি পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া তৎকাল-প্রচলিত পারস্য ভাষা অধ্যয়নার্থ সবিশেষ যত্নবান হয়েন, কিন্তু পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত শিক্ষককে বেতন দিয়া অধ্যয়ন করা তাহার ক্ষমতাতীত

ছিল ; তথাপি ঐ ভাষা শিক্ষার্থ তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মে। অনন্তর তাঁহার প্রতিবেশী এক কায়স্থ কোনও বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে কিছুদিনের জন্য খিদিরপুরে অবস্থিতি করেন। তাঁহার পাকাদি-কার্য্য নির্ব্বাহার্থ এক পাচকের আবশ্যক হইলে, জগন্মোহন তাঁহাকে অনুনয় পূর্ব্বক বলেন, যদি আপনি কৃপা করিয়া আমায় পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করান, তাহা হইলে, আমি বিনা বেতনে আপনার আবাসে পাকাদি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিব।

জগন্মোহনের এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া, খিদিরপুরে যান। জগন্মোহন তথায় প্রভুর আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া, প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, দুই বেলা সাতিশয় পরিশ্রম করিয়া অধিক লোকের পাকাদি কার্য্য নিষ্পাদন ও অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত জাগরণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাতে, বালক জগন্মোহন বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। সুতরাং তিনি প্রভুর কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে পাথেয়াদি কিছুই

না দিয়া দেশে প্রতিগমনের আদেশ করেন। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি দেশে যাই-বার পথ জানি না, বিশেষতঃ আমার কিছুমাত্র সম্বল নাই। এ অবস্থায় একাকী কেমন করিয়া দেশে প্রতিগমন করিব। ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনেও তাঁহার নির্দ্দয় প্রভু, জগন্মোহনের গাত্র হইতে শীতবস্ত্র লইয়া বলি-লেন, তোমার পদে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হইবে, তাহাকে এই শীতবস্ত্র দিতে হইবে। তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও; এখানে রোদন করিতে পাইবে না। খিদিরপুরের পোলে বসিয়া রোদন কর।

নিরুপায় জগন্মোহন বাসা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দশ দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, এবং অগত্যা খিদিরপুরের পোলের উপর অনাবৃত শরীরে উপবিষ্ট হইয়া, সমস্ত দিন পৌষ মাসের দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অপরাহ্ণে তাঁহার স্বদেশবাসী সদাশয় এক ধনশালী মহাজন তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া, সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

জগন্মোহন সাশ্রুলোচনে ও গদ্গদবচনে আদ্যো-পান্ত সমস্ত বর্ণন করিলে, তিনি দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে যথোচিত আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক, স্বীয় নৌকায় আরোহণ করাইয়া দেশে পঁহুছাইয়া দেন। ইহাতেই সে যাত্রা জগন্মোহনের প্রাণরক্ষা হয়।

জগন্মোহন এরূপ কষ্ট পাইয়াও লেখাপড়া শিক্ষা বিষয়ে কিছুমাত্র ভগ্নোদ্যম হন নাই; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক যত্ন ও অসীম উৎসাহ সহ-কারে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার আবাস স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ঘোড়া-মারা নামক গ্রামে বিচক্ষণ, বিদ্যোৎসাহী মাণিক মিঞা নামক এক মুসলমান বাস করিতেন। তিনি মেদনীপুরের আদালতে একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তিনি বার্দ্ধক্য নিবন্ধন, কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় সদনেই অবস্থিতি করি-তেন। জগন্মোহন তাঁহারই সমীপে অভিলষিত পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

পিঙ্গলা ও ঘোড়ামারা এই উভয় গ্রামের মধ্যে এক খাল আছে। বর্ষাকালে ঐ খাল ও মাঠ জলে এরূপ প্লাবিত হইত যে, ডোঙ্গা ব্যতীত কেহ পারা-

পার হইতে সমর্থ হইত না। জগন্মোহনের এরূপ সঙ্গতি ছিল না যে, প্রত্যহ নাবিককে একটি পয়সা দিয়া পার হন। অগত্যা তিনি গাত্রমার্জ্জনী পরিধান পূর্ব্বক পুস্তক ও পরিধেয় বস্ত্র মস্তকে বন্ধন করিয়া নির্ভয়চিত্তে সন্তরণ করতঃ ঐ খাল পার হইতেন। বর্ষার চারিমাস এইরূপ কষ্ট করিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষায় এরূপ অদ্ভুত অনুরাগ দেখিয়া, দেশস্থ লোক অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইতেন।

তাঁহার বৃদ্ধ জনক জননীর ও সহোদরের দিন নির্ব্বাহের অন্য কোনও উপজীবিকা ছিল না। তিনি প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক স্বহস্তে তৎকালীন পাঠশালার পাঠোপযোগী পুস্তক দাতাকর্ণ, গঙ্গার বন্দনা ও শিশুশিক্ষা লিখিয়া, প্রাতে সন্নিহিত কৃষকপল্লীতে তদ্বিনিময়ে যে তণ্ডুল প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দ্বারা সকলের জীবনরক্ষা হইত। এইরূপে তিনি কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া পারস্য ভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

জগন্মোহনের পাঠাবস্থায় এক ধনশালী লোক স্বীয় দুহিতার বিবাহার্থ এক সৎপাত্রান্বেষণে পিঙ্গলা গ্রামে উপস্থিত হন। তিনি, যে ধনীর

পুত্রের উদ্দেশে আসিয়াছিলেন, সে পাত্রের হস্তাক্ষর অতি জঘন্য ; বিশেষতঃ ঐ পাত্র পারস্য ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। এই হেতু ঐ পাত্র তাঁহার মনোনীত হইল না। তখন তিনি অপর কোনও সৎপাত্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, জগন্মোহনকে পুস্তক হস্তে ও আর্দ্র গাত্রমার্জ্জনী স্কন্ধে করিয়া, সন্ধ্যার সময় অধ্যয়-নান্তে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিলেন এবং পথিমধ্যে তাঁহার সহিত কথোপকথনে পরম প্রীত হন ও তাঁহাকে সদ্বংশসম্ভূত জানিয়া তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে তথাকার অনেকে এরূপ দরিদ্রসন্তানকে কন্যা প্রদান করিতে নিবারণ করেন। কিন্তু তিনি তাহা শুনিয়া, তাঁহা-দিগকে উত্তর করেন যে, আমি ধন দেখিয়া এই সম্বন্ধ স্থির করিতেছিনা। জগন্মোহন বিদ্বান, ও ধীশক্তিসম্পন্ন, এই হেতু ইহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইতেছি বালক এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াও যেরূপ যত্নসহকারে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে, এ ভবিষ্যতে নিশ্চয় এক জন অসাধারণ লোক হইবে।

অতঃপর জগন্মোহন বৃদ্ধ জনক জননীর অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং যথাশক্তি উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাদের সাংসারিক ক্লেশ নিবারণ মানসে মেদিনীপুর যাত্রা করেন। তথায় তিনি পিঙ্গলাগ্রামবাসী প্রতিবেশী এক স্বসম্পর্কীয়ের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ ব্যক্তি কালেক্টরীর একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। ঐ সূত্রে জগন্মোহন কালেক্টরীতে তাঁহার নিকট কার্য্য প্রণালী শিক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হন। তিনি স্বল্পদিনের মধ্যেই কালেক্টরীর যাবতীয় কার্য্য-প্রণালী সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে কালেক্টরীর দেওয়ানের পদ অতি গৌরবের ছিল ; এই পদ অতি দুর্লভ ছিল। অধিক কি সুপ্রসিদ্ধ রামমোহন রায় ও চন্দ্র-শেখর ঘোষ প্রভৃতি অনেক মহানুভব লোকেরা কালেক্টরীর দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়া, সাধার-ণের সমীপে সাতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। বোধ হয়, জগন্মোহন ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কালেক্টরীর কার্য্যাবলী শিক্ষার্থ অতিশয় যত্নবান্ ছিলেন।

কিছুদিন পরে ফৌজদারী আদালতে মাসিক

৫৲ টাকা বেতনের এক সামান্য পদ শূন্য হইলে, তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন। অনন্তর ঐ আদালতের বিচারপতি জগন্মোহনের কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত উচ্চপদে উন্নীত করেন।

তৎকালে দলীল সকল পারস্য ভাষায় লিপিবদ্ধ হইত। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ঐ ভাষায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, পারস্য ভাষায় দলীল লিখনে স্বল্পকাল মধ্যেই অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

তৎকালীন ভূম্যধিকারী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা জগন্মোহনের দ্বারা আবেদন পত্রাদি রচনা করাইয়া লইতেন, এবং তাঁহার সহিত আইনের তর্ক ও পরামর্শ করিয়া, অভিযোগে প্রবৃত্ত হইতেন। আবেদনপত্র রচনাকার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। ঐ সময়ে সাধারণ লোকের এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, জগন্মোহন আবেদন পত্রাদি রচনা করিয়া দিলে মকদ্দমায় অবশ্য জয়লাভ হইবে। এই হেতু মেদনীপুর জেলাস্থ অনেকেই তাঁহার নিকট দলীল, অভিযোগপত্র ও বর্ণনাপত্র রচনা করাইবার জন্য যাইত।

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় বহু লোকের সমাগম হইত। এই কার্য্যে তাঁহার প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হইত, তথাপি তিনি কেবল সন্মানের জন্য সামান্য বেতনের আদালতের পদ পরিত্যাগ করেন নাই।

কিছুদিন পরে, কালেক্টর সাহেব তাঁহার কার্য্য-কুশলতা সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কালেক্টরীর মীরমুন্সী পদে নিযুক্ত করেন; জগ-ন্মোহন দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদন করাতে, উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবেরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

ঐ পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে, তিনি তিন বৎসরের জন্য মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে মেদিনীপুরের দক্ষিণ মাজনা প্রভৃতি পরগণার তহশীলদারের পদে নিযুক্ত হন। কাঁথি তাঁহার প্রধান কার্য্যস্থল ছিল। যে স্থলে তাঁহার কাছারী হইত, অদ্যাপি তাহা জগন্মোহনবাগিচা নামে প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহাকে ভূমির কর নিরূপণের কার্য্য করিতে হইত। তিনি এরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে, গবর্ণ-মেণ্টের ও প্রজাগণের নিকট প্রশংসার ভাজন

হইয়াছিলেন। পতিত ভূমি সকল স্বল্প করে বিলি করিয়া, তিনি প্রজা ও রাজা উভয়েরই সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশের প্রজা-গণ সামান্য করে ভূসম্পত্তি পাইয়া সমধিক লাভ-বান্ হইয়াছে। অদ্যাপি তৎপ্রদেশের বৃদ্ধ লোকেরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক সময়ে সময়ে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া থাকেন।

যে সময়ে মেদনীপুর জেলায় (সরবে) জরীপের কার্য্য আরম্ভ হয়, তৎকালে তিনি উচ্চ বেতনে সদর আমীন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কি দেশীয় কি বিদেশীয়, অনেক ব্যক্তিকে যোগ্যতানুসারে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অন্নসংস্থাপন করিয়া দেন।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে কালেক্টরীর সেরেস্তাদারের অর্থাৎ দেওয়ানের পদ শূন্য হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পদে নিযুক্ত করেন।

এত দিনের পর জগন্মোহন অভিলষিত পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এরূপ নিপুণতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া-ছিলেন যে, ত্বরায় তাঁহার সর্ব্বত্র খ্যাতি ও

প্রতিপত্তি হইয়াছিল। ঐ আদালতের সাহেবেরাও তাঁহার কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

জগন্মোহন অত্যন্ত উন্নতমনা ও দয়ার্দ্রচেতা লোক ছিলেন। তিনি মেদিনীপুরে কালেক্টরীর সেরেস্তাদারের পদে যত দিন নিযুক্ত ছিলেন, তত দিন, পরিচিত লোকের সম্পত্তি, বাকী রাজস্বের জন্য নীলামে আসিত না ; কারণ, জগন্মোহন স্বয়ং বা অন্যের নিকট ঋণ করিয়াও ঐ সকল লোকের বাকী রাজস্ব দিয়া বিষয় রক্ষা করিয়া দিতেন। এই হেতু ঐ সময়ে মেদিনীপুর জেলায় সাধারণের সমীপে তাঁহার প্রশংসাবাদ হইত। জগন্মোহন ধনলোভী হইলে, তৎকালে ঐ সকল লোকের সম্পত্তি স্বয়ং বেনামী করিয়া লইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিতেন। তাঁহার মত পরহিতৈষী লোক অতি বিরল।

জগন্মোহন অতি দুঃখীর সন্তান ছিলেন। তিনি এই গৌরবের পদ প্রাপ্ত হইয়াও কখনও আপন পদের গৌরব করিতেন না, এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত প্রণয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কার্য্য করিতেন। তিনি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী-

দিগকে যোগ্যতানুসারে উচ্চপদে উন্নীত করিয়া দিতেন।

জগন্মোহন বাল্যকালে অত্যন্ত অন্নকষ্ট পাইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি স্বগ্রামে এক অতিথিশালা সংস্থাপিত করেন। প্রতিদিন ঐ অতিথিশালায় অভুক্ত বহু অতিথি ও অভ্যাগত লোক ভোজন করিত। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি বৎসর জগন্নাথের ও গঙ্গাসাগরের শত শত সন্ন্যাসী যাত্রীদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইতেন, এবং প্রত্যেককে বস্ত্র, কম্বল, জলপাত্র ও কিছু কিছু পাথেয় প্রদান করিতেন।

তিনি মেদিনীপুরের আবাসে অন্যূন ৩০টি করিয়া দরিদ্রসন্তানকে অন্ন দিয়া লেখাপড়া শিখাইতেন। পরে উহারা শিক্ষিত হইলে উহাদিগকে যথাযোগ্য চাকরী করিয়া দিয়া তাহাদের অন্নসংস্থান করিয়া দিতেন। বাসায় ঐ সকল দরিদ্রবালকের ভোজন সময়ে, জগন্মোহন স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতেন, "বাল্যকালে লেখাপড়া শিক্ষার সময়ে আমি অত্যন্ত অন্নকষ্ট পাইয়াছি। তৎকালে আমি মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলাম

যে, যদি ঈশ্বর আমাকে কখনও অর্থ দেন, তাহা হইলে আমার মত হতভাগ্যদিগকে অন্ন দিয়া লেখাপড়া শিখাইব”।

তিনি দরিদ্র স্বসম্পর্কীয়গণের সাংসারিক কষ্ট নিবারণার্থ বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন; এবং সাধারণ লোকের জলকষ্ট নিবারণ মানসে স্থানে স্থানে অনেকগুলি সরোবর খনন করিয়া দিয়াছিলেন।

তৎকালে ডাক্তারি চিকিৎসা ছিল না, তিনি স্বীয় সদনে বিচক্ষণ বৈদ্যশাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক রাখিয়া নিজ পরিবারদের ও সমাগত দরিদ্রগণের চিকিৎসা করাইতেন। দূরদেশ হইতে আগত রোগীদিগকে বাটীতে রাখিয়া পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন,এবং তাহারা আরোগ্যলাভ করিলে পাথেয় দিয়া বিদায় করিতেন।

তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকগণকে সাতিশয় সম্মান করিতেন। যে সকল অধ্যাপক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তিনি তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া কিছু অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিতেন।

জগন্মোহন অন্যূন চারিশত দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকদিগের বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার ত্যক্ত ভূসম্পত্তি হইতে অনেকে পুরুষানুক্রমে ঐ বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। কন্যা-দায়গ্রস্ত ও মাতৃপিতৃহীন কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, জগন্মোহনের নিকট গমন করিলে তিনি অকাতরে ঐ সকল দায়োদ্ধারের জন্য প্রচুর সাহায্য করিতেন।

তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত অন্নের কষ্ট পাইয়াছিলেন, তজ্জন্য অর্থাপেক্ষা অপরিমিত ধান্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন। যখন বিষম দুর্ভিক্ষে দরিদ্রলোক সকল অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে লাগিল, তৎকালে দয়ার্দ্রচেতা জগন্মোহন পিঙ্গলা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী দরিদ্রদের দ্বারে দ্বারে সকলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক প্রত্যেক পরিবারের যথোপযুক্ত ভোজনোপযোগী ধান্য অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার ধান্যোৎপাদন না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপে ধান্য বিতরণ করিয়া, তিনি ঐ সময়ে বিস্তর লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

তিনি প্রায় তিন বৎসর কাল পেন্‌সন ভোগ করিয়া, এবং সাতটী পুত্র রাখিয়া ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে চতুরধিক-ষষ্টিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

বাপুদেব শাস্ত্রী।

বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী পুনানগরে ১৮২১ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মণকুলে বাপুদেবের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা একজন সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শৈশবকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ পুত্রকে এক সামান্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তথায় কিছু শিক্ষা হইলে পর, ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তিনি বাপুদেবকে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিয়া দেন। কিঞ্চিদূন দুই বৎসর কাল সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া, কিঞ্চিৎ সংস্কার জন্মিলে পর, প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত করেন।

বাপুদেব সাতিশয় শ্রমশীল ও মেধাবী ছিলেন। বিশেষতঃ গণিত শাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক স্ফূর্ত্তি পাইত; সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ঐ শাস্ত্রের অধিকাংশই শিক্ষা করেন।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দে বাপুদেব পুনা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পিতৃদেবের সহিত নাগপুরে আগমন

করেন। তথায় তিনি মনঃসংযোগ সহকারে সংস্কৃত ব্যাকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী পাঠ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে, মধ্য প্রদেশের তৎকালীন রাজ-প্রতিনিধি (পলিটিকেল এজেণ্ট) মহামতি উইল্‌কিন্‌সন্ সাহেব নাগপুর ভ্রমণে আগমন করেন। বাপুদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। সাহেব মহোদয় বালক বাপুদেবের অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধির ও লেখাপড়ায় অনুরাগের সম্যক পরিচয় পাইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হন; এবং স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র "সিহোর" প্রত্যাগমন কালে বাপুদেবের পিতার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক বাপুদেবকে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যান।

তথায় যাইয়া বাপুদেব স্থানীয় সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকালে "জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ" পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং বৈকালে "হিন্দি স্কুলের" বিদ্যার্থীদিগকে পাটীগণিত ও বীজগণিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক দুষ্প্রাপ্য উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থনিচয় সংগ্রহ করা ছিল। অসাধারণ ধীসম্পন্ন বাপুদেব

ঐ সমুদায় গ্রন্থ যত্ন ও অবিচলিত অধ্যবসায় সহ-কারে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ঐ বিষয়ের আলোচনা কালে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক স্ফূর্ত্তি পাইত ; সুতরাং পাঠকালে তাঁহার বুদ্ধি কোনও রূপেই প্রতিহত হইত না। পাঠের সময় তাঁহার মন এরূপ অভিনিবিষ্ট হইত যে, তিনি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাইতেন।

এইরূপে বাপুদেব প্রায় দুই বৎসর কাল জ্ঞানোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে বারাণসীস্থ সংস্কৃত কালেজে গণিতাধ্যাপকের পদ শূন্য হইল। বাপুদেবের পরম হিতৈষী উইল্‌-কিন্‌সন্‌ সাহেব এই সংবাদ পাইয়া, বাপুদেবকে ঐ পদের সম্যক যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট বাপুদেবের গুণ কীর্ত্তন করিয়া এক পত্র লিখিলেন।

কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বাপুদেবের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া, সানন্দচিত্তে তাঁহাকে ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ পদ প্রদান করেন। এই সময়ে বাপুদেবের বয়ঃক্রম একবিংশ বর্ষ মাত্র।

যুবক বাপুদেব এই উচ্চ পদে সমাসীন হইয়া

এরূপ সুচারুরূপে ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, কি ছাত্রবৃন্দ, কি অধ্যাপকমণ্ডলী, কি কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। গবর্ণমেণ্ট, গণিতশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় দৃষ্টি দেখিয়া, গণিতবিষয়ক কোনও কূটতর্ক উপস্থিত হইলেই, ঐ প্রশ্ন বাপুদেবের নিকট উপস্থিত করিতেন। বাপুদেবও ঐ সমস্ত প্রশ্নের এরূপ বিশদ মীমাংসা করিয়া দিতেন যে, ঐ বিষয়ে আর কাহারও কোনওরূপ সংশয় থাকিত না।

বাপুদেব হিন্দি ভাষায় পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে বীজগণিত রচনা করেন। এই পুস্তক এরূপ যত্নসহকারে ও সুন্দররূপে রচিত হইয়াছিল যে, তদ্দৃষ্টে পরিতুষ্ট হইয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশ সমূহের তাৎকালিক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর টম্সন সাহেব মহোদয় তাঁহার বিদ্যাবত্তার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে দুই সহস্র মুদ্রা "খেলাৎ" প্রদান করেন।

এইরূপে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া বাপুদেব পুস্তক রচনায় অনুরাগী হইলেন এবং

অল্প দিনের মধ্যে গণিতশাস্ত্রের অনেক পুস্তক রচনা করিলেন। তিনি এরূপ সহজ প্রথানুসারে অতি দুরূহ গণিতশাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন যে, সকলেরই ঐ শাস্ত্রে অনায়াসে প্রবেশাধিকার হইয়া উঠে।

কিছু দিন পরে তিনি বীজগণিতের দ্বিতীয় ভাগও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকও ঐরূপ সহজ ও সুন্দর প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং তাৎকালিক গুণগ্রাহী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর উইলিয়ম মুইর সাহেব মহোদয় সন্তুষ্ট হইয়া এলাহাবাদ নগরের প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে এক সহস্র মুদ্রা এবং এক জোড়া শাল পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

ক্রমে বাপুদেবের সুখ্যাতি পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। কি রাজন্যমণ্ডলী কি বিদ্যন্মণ্ডলী সকলেই বাপুদেবের নামে মোহিত হইতে লাগিলেন। গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে কখনও কাহারও কোনও সন্দেহ জন্মিলে, কেহ বা পত্র দ্বারা জানাইতেন, কেহ বা স্বয়ং বাপুদেবের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন। বাপু-দেবও ঐ সমুহের যথাযথ মীমাংসা করিয়া দিয়া

তাঁহাদের হৃদয়ের উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন।

বাপুদেব গ্রেটব্রিটেনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর অবৈতনিক মেম্বরের পদে এবং বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য পদে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন। অবশেষে তিনি স্বদেশের হিতকামনায় যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন স্বরূপ এক উপাধি (সি, আই, ই) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৯২ খৃঃ অব্দে একসপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

এক্ষণে অঙ্ক শাস্ত্রে ইউরোপীয়েরা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিলাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে এককালে গণিতশাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল, তাহা ইউরোপীয়েরা একবারেই জানিতেন না। বাপুদেব শাস্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপীয়দের নিকট ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন এবং সংস্কৃত গণিতের চর্চ্চা করিয়া ইউরোপেও বিশিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে আগষ্টে বোম্বাই নগরে ব্রাহ্মণকুলে কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বাবুজী রামচন্দ্র। বোম্বাই নগর ইঁহাদের আদি বাসস্থান নহে। কাশীনাথের পিতামহ কোনও এক সওদাগরের আফিসে কর্ম্মোপলক্ষে পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বোম্বাই নগরে বাসার্থ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তদবধি বোম্বাই নগরেই এই তেলাঙ্ পরিবার বাস করিতেছেন।

রামচন্দ্রেরা চারি সহোদর। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ত্র্যম্বক রামচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন। এই জন্য তিনি, সাড়ে চারি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কাশীনাথকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীনাথ শৈশবকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ অমরচাঁদওয়াদী নামক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। পরে তিনি নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়নার্থ এলফিন্‌ষ্টোন্ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় তিনি, যখন যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন সেই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত

হইতেন এবং সকল শ্রেণীতে উচ্চবৃত্তি অথবা উচ্চ পুরস্কার যাহা কিছু প্রদত্ত হইত, তাহা কাশীনাথই প্রাপ্ত হইতেন।

আমাদের দেশে অনেকে লেখাপড়ায় অনুরাগ বশতঃ সর্ব্বদাই পুস্তক পাঠে নিযুক্ত থাকেন, শরীরের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না, কিন্তু কাশীনাথ সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি মানসিক উন্নতির যেরূপ আদর করিতেন, শারীরিক উন্নতিরও সেইরূপ গৌরব করিতেন। তিনি প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়াম করিতেন; সুতরাং মানসিক উন্নতির সহিত তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অস্বাস্থ্য তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার কথনই প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে পারে নাই।

কাশীনাথ আন্তরিক অনুরাগ ও অধ্যবসায়গুণে পাঁচ বৎসরের মধ্যে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কালেজে পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া এম, এ পরীক্ষায় বিশেষ দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হয়েন। পরবৎসর কাশীনাথ ব্যবহারশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হন।

কাশীনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া উচ্চতম উপাধি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে, তাহা তখনও রীতিমত আরব্ধ হয় নাই। বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র এবং অর্থনীতি অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এই সামান্য পাঠে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, সুতরাং কালেজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় ঐ দুই শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি-লাভার্থ যথারীতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ঐ দুই শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ হওয়াতে তিনি উত্তরকালে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিচারপতি বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন।

১৮৭২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কালেজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি যে কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

কালেজের সংশ্লিষ্ট এক বৃহৎ লাইব্রেরী গৃহ ছিল। কাশীনাথের নিমিত্ত ঐ পুস্তকালয়ের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। কাশীনাথ কালেজের কার্য্য রীতিমত সমাপন করিয়া, অবসর কালে ঐ

পুস্তকাগারে গমন পূর্ব্বক, প্রশংসিত গ্রন্থকারগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ আগ্রহাতিশয় সহকারে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেন। তিনি পাঠে এরূপ মনঃসংযোগ করিতেন এবং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে, যাহা পাঠ করিতেন, তৎসমুদায়ই তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইত। কিছু দিনের মধ্যে ঐ পুস্তকাগারে এরূপ এক খানিও পুস্তক রহিল না, যাহা কাশীনাথের অপঠিত বা অনায়ত্ত রহিয়া গেল।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে কাশীনাথ বোম্বাই হাই-কোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট নামক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল; সুতরাং অচিরকালমধ্যেই তিনি হিন্দুব্যবহারা-ধ্যায়ে একজন অদ্বিতীয় ব্যুৎপন্ন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে তিনি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক শিক্ষাকমিসনের সভ্যপদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে এই কমিসনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনে পারদর্শিতা দর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত হন।

কাশীনাথের গভীর জ্ঞান ও তদানুষঙ্গিক তর্ক-শক্তি দেখিয়া কি বিচারপতিগণ, কি উকিলগণ, কি জনসাধারণ সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। এমন কি প্রধান বিচারপতি মাননীয় সার মাইকেল ওয়েষ্ট্রপ্ সাহেব মহোদয় মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্যভাবে বলিতেন, "এমন দিন আসিবে, যখন এই যুবক জজ হইবেন।" কিছুকাল পরে ঐ মহাত্মার বাক্য যথার্থই হইয়াছিল। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে সমাসীন হইলেন। ওকালতি করিবার সময়ে যে আইন জ্ঞান, যে তর্কশক্তি, তাঁহার সর্ব্বোচ্চ পদে আরোহণের সোপানস্বরূপ হইয়াছিল, বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে ঐ দুইটি গুণ সমধিক স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তিনি তুলাদণ্ডে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার বিচারে, কি অর্থী, কি প্রত্যর্থী, কি ব্যবহারবিদ্গণ সকলেই সমান ভাবে সন্তুষ্ট হইতেন।

বিজ্ঞ, অদ্বিতীয় ব্যবহারবিদ্ ও সুবিচারক ছিলেন বলিয়া, কাশীনাথের এতাদৃশী খ্যাতি ও

প্রতিপত্তি নহে ; তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়, অসীম কার্য্যানুরাগ এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছিল। অধ্যবসায়ের অভাবে তাঁহাকে কখনও কোন কর্ম্ম হইতে বিমুখ হইতে হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ অতি বিরল। যে কার্য্যে তিনি একবার হস্তার্পণ করিতেন, তাহা কায়-মনোবাক্যে সমাধা করিতেন। দেশহিতকর কার্য্যে তিনি আগ্রহাতিশয়ে সম্মিলিত হইতেন। ওকা-লতি করিবার সময়ে এমন কোনও দেশহিতকর কার্য্য ছিল না, যাহাতে কাশীনাথের বিদ্যা বুদ্ধি ব্যয়িত না হইত। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি এমন অনেক সৎকার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, যাহা কালে সম্পন্ন হইয়া উঠিলে, ভারতবাসীদের বহুল উপকার হইবার সম্ভাবনা।

যে স্থলে প্রজাবর্গ মিলিত হইয়া রাজনৈতিক কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিত, বিচারাসনে সমাসীন হইয়া কাশীনাথ আর ঐ আন্দোলন-ক্ষেত্রে পূর্ব্বের মত সাধারণের সহিত যোগদান করিতে পারিতেন না। কারণ, বিচারপতিগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকা রাজনীতি-বিরুদ্ধ। তিনি এই সময় হইতে সাহিত্যরচনায়

মনোনিবেশ করেন। ইহাতেও তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্যক্ প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থে তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাশীনাথ যে ভগবদ্গীতা ইংরাজী ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিমোহিত হইয়াছেন। ফলতঃ ভারত-বাসীর লেখনী হইতে এরূপ কবিতা ইংরাজী ভাষায় রচিত হওয়া অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

পরে ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত হইবার জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন তাহা অস্বীকার করেন।

গুরুতর বিচার কার্য্য যথারীতি সমাপন পূর্ব্বক প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের আলো-চনা করা যে কিরূপ গুরুতর ব্যাপার, তাহা সহজে অন্যের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া দুষ্কর; কিন্তু

কাশীনাথ এই সমস্ত সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি দেশহিতকর নানারূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বোম্বাই প্রদেশস্থ সুরাপান-নিবারিণী সমিতি, ছাত্র সমাজ, সাহিত্যসমাজ, বিজ্ঞানসভা প্রভৃতির অধ্যক্ষতা কার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ত্রিচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে লোকযাত্রা সংবরণ করেন।

নিরলস ও অধ্যবসায়শীল হইয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিলে মানুষ কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারে, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ তাহার একটি প্রধান উদাহরণ-স্থল। কাশীনাথ বিদ্যার্জ্জন-বলে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন।

সম্পূর্ণ।

Opinion of the Press.

"*Charitamālā*, Part I by Sambhu Chandra Vidyāratna, Second edition, Calcutta, Anglo-Sanskrit Press, 1301, (B. S.) Price 4 annas. *Charitamālā*, Part II, by Sambhu Chandra Vidyāratna, Second edition, Calcutta, Anglo-Sanskrit Press, 1301 (B. S.)

Pundit Sambhu Chandra Vidyāratna is a man of original ideas. He is the third brother of the late Pundit Iswara Chandra Vidyāsāgara. Possessed of considerable attainments in Sanskrit and having a large experience of what is actually required for the education of our children, Pundit Sambhu Chandra has compiled an exceedingly instructive book (in 2 parts) containing short biographical sketches of Indian celebrities. * * *

Our children, again, while fully able to give particulars of the lives of Vallentine Jameray Duval and Christian Gottlob Heyne, or a complete list of monarchs of the Plantagenet or the Stuart line, are entire strangers to such names as Harish Chandra Mookerjee and Ram Gopāl Ghose, and Radhakanta Deb, Raghunath Shiromani and Ramnath Tarkasiddhānta, Vapudeva Shastri and K. T. Telang. The attempt, therefore, of Pundit Sambhu Chandra Vidyāratna to supply such a class-book for familiarising our boys with some of the greatest men of India, should be hailed with joy by every man interested in native education. It has given us sincere pleasure to see that the Central Text-Book Committee have approved of the book. Something more, however, than this is necessary. The authorities of the Education Department should make it obligatory on every elementary school in the country to adopt the *Charitamālā* as a class book in the lower forms".—*Reis and Rayyet, December 29, 1894.*

4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA.

The 2nd January, 1893.

You are informed that your book entitled Charitamālā, Part II, has been approved for use as a Text-Book by the members of the Central Text-Book Committee.

(*Sd.*) Isan Chandra Ghosh,

For Secretary, Central Text-Book Committee.

From Dr. Fitzedward Hall.

(*Marlesford, Wickham Market, England.*)

"It is a happy and patriotic idea, your commemorating the more noteworthy of your recent countrymen. Among them I notice with gratification several of my old personal friends. My respected teacher and co-editor, Bāpudeva Sāstri, with whom I enjoyed several years' intercourse, I am glad to see that you have biographized. In many respects he was a remarkable man. Eminent as a scholar, he was likewise estimable in his private relations."

"Charitamālā Part I and Part II by Pundit Shambhu Chandra Vidyāratna. The author, who is possessed of considerable attainments in Sanskrit and has had a vast experience of what is required for the education of our children, has compiled in easy and plain style the two above-named books, containing instructive biographical sketches of some of our Indian celebrities. Our young boys are usually well posted in particulars about some of the European celebrities but are quite strangers to the names of their own great men, living or dead. The author's attempt is, therefore, commendable. We are glad to know that his books are approved of by the Text-Book Committee. It now remains for the Educational authorities to introduce the books in the junior classes of Indian Schools."—*The Hindoo Patriot, Monday, July 1st, 1895.*

Opinion of the Press.

"চরিত্রমালা।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত; ইংরাজি-সংস্কৃত যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।० এবং ।৶०।

"Example is better than precept. এটী অতি পুরাতন প্রবাদ। একটী প্রকৃত মহৎ লোকের জীবনের সদ্য প্রভাব এবং জীবন্ত দীপ্তি যেরূপ অনায়াসেই চতুর্দ্দিকে সংক্রামিত হয়, জীবনশূন্য অগভীর শত মৌখিক উপদেশও তাদৃশ হয় না। জীবনচরিতের প্রধান উদ্দেশ্য—সমাজের এই অশেষ কল্যাণদায়িনী শক্তিকে জাগ্রত এবং স্থায়ীরূপে রক্ষা করা। জীবনচরিত যখন বিদ্যালয়ে অধীত হয়, তখন এই শক্তি শিক্ষার্থীদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। চরিত্রমালার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বর্ণিত চরিত্রগুলি প্রায় সমস্তই বঙ্গদেশবাসীর। বাল্যকালে সুদূর ইউরোপ এবং মার্কিন দেশীয় চরিতাখ্যায়িকা পাঠকরিয়া একটা ভাসা ভাসা স্বপ্ন কিম্বা উপন্যাস-সুলভ ভাবের উদ্রেক হইত। স্বতন্ত্র জলবায়ুপরিপুষ্ট দূরদেশবাসীর চরিত্রদৃষ্টান্ত যেন ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ কার্য্যকর হইত না। কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় দেখাইয়াছেন, আমাদেরই মধ্য হইতে, অতি সামান্য অবস্থা হইতে, যত্ন এবং অধ্যবসায় শীল মনস্বিগণ কি প্রকারে আপনাদিগকে উন্নত করিয়াছেন এবং দেশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। চরিত্রমালার ভাষা সরল এবং মধুর।"—নব্যভারত, চৈত্র ১৩০১

"চরিতমালা। শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। কলিকাতা ২নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন হইতে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য চারি আনা মাত্র।

ইহাতে দেশীয় ১৫ জন কৃতবিদ্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। আমাদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনচরিত ভালরূপ নাই। সুতরাং এরূপ পুস্তকের যত প্রচার হয়, ততই মঙ্গল। পুস্তক খানির ভাষা অতি সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইংরাজি বিদ্যালয়ের ৫ম, ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রগণের উপযোগী হইয়াছে। ডুবালের জীবনী পাঠ অপেক্ষা রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণের জীবনী পাঠ অতীব প্রয়োজনীয় ও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।"—সোমপ্রকাশ, ১৭ই মাঘ সন ১৩০০।